পূর্ণকাম পরাভব

শ্রীমতী পারুল ভট্টাচার্য

ভোলানাথ প্রকাশনী
৩৭/১, বেনিয়াটোলা লেন · কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
শুভ মহালয়া :
২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৫

প্রকাশক :
শ্রীসুরেশ দাশ
লেক টাউন
কলিকাতা—৮৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
মৃণাল কান্তি রায়

মুদ্রণ :
নিউ শ্রীমা প্রেস
৬১/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

মহাভারত যিনি শিখিয়েছিলেন—স্বর্গত সেই
দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে—

খুকী

গ্রন্থ প্রসঙ্গে

অর্জুনের চিত্রাঙ্গদা পরিণয় মহাভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে অত্যন্ত অবমাননাকর কিছু শর্ত স্বীকার করে চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করেছিলেন অর্জুন। ফলতঃ পত্নী তাঁর বশ্যা হন নি, চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত পুত্রের উপরেও বর্ত্তায়নি তাঁর কোনও অধিকার। প্রমাণ—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে পাণ্ডব ভ্রাতাদের অপরাপর সব পুত্র যখন পিতৃকুলের সাহায্যার্থে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, তখন ব্যতিক্রম কেবল চিত্রাঙ্গদা পুত্র বভ্রুবাহন। (উল্লেখ্য মাতামহ বিচিত্রবাহনের নামানুসারে তাঁর নামকরণ হয়েছিল বভ্রুবাহন)।

পরবর্ত্তীকালে অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া নিয়ে মণিপুরে উপস্থিত হন অর্জুন এবং এক তুচ্ছ কথান্তর উপলক্ষ করে পিতাপুত্রে প্রাণঘাতী যুদ্ধ বেধে যায় এবং সে যুদ্ধে শোচনীয় ভাবে পরাজিত ও মুমূর্ষু হন অর্জ্জুন। চিকিৎসান্তে সুস্থ হয়ে (মহাভারতকার যাকে অর্জ্জুনের পুনর্জীবন লাভ বলেছেন) পুত্রসহ যখন তিনি হস্তিনায় ফিরছিলেন মধ্যপথ থেকে দ্রুতগামী এক দূত পাঠিয়ে বভ্রুবাহনের জন্য বিশেষ অভ্যর্থনা ও সমাদরের ব্যবস্থা রাখতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন কৃষ্ণকে। এই ব্যবস্থার মধ্যে পুত্র স্নেহ যত, এক স্বাধীন স্বপ্রতিষ্ঠ শক্তিমান নরপতির প্রতি সমীহ বোধ প্রকাশ পেয়েছে তার চেয়ে বেশী। এই পুত্রকে সমীহ—হয়তো বা কিছুটা ভয়ও পেতে সুরু করেছিলেন অর্জ্জুন।

স্বভাবতঃই এই সব ঘটনা কেন ঘটেছিল সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু পাঠকের কৌতুহল নিরসন করার চেষ্টা করা হয়েছে এই গ্রন্থে।

শ্রীঅনন্তদেব ঘোষের অসীম চেষ্টা ও পরিশ্রম ভিন্ন এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হত না। তাঁকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা নেই। ধন্যবাদ ভোলানাথ প্রকাশনীর শ্রীসুরেশ দাসকেও। বাজারে চলতি ও কাটতি গল্প উপন্যাসের পরিবর্ত্তে এই গুরুভার রচনাটির প্রকাশে সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তিনি। ইতি—

শ্রীমতী পারুল ভট্টাচার্য

॥ ১ ॥

সহসা অশ্বরশ্মি সংযত করলেন তিনি। শক্তিমান বাহুপেশী বিস্ফারিত হয়ে উঠল, রুদ্ধ হল মহাবেগে ধাবমান রথগতি। আকস্মিক আকর্ষণে বিভ্রান্ত অশ্ব-চতুষ্টয় চকিতে পা তুলে দিল শূন্যে, তীক্ষ্ণ এক হ্রেষারবে আপত্তি প্রকাশ করে স্থির হয়ে দাঁড়াল আবার।

রথ ছেড়ে নেমে এলেন তিনি। বিক্ষুব্ধ তুরঙ্গদের শান্ত করলেন সাদর চাপড়ে। তারপর দৃষ্টিপাত করলেন পিছনে। অনুচরগণের চিহ্নমাত্র নেই। কোথায় গেল্ তারা! বিস্তীর্ণ সর্পিল পথরেখা পড়ে আছে শূন্য। মানুষের সঞ্চরণ নেই সে পথে। দুধারে প্রশান্ত অরণ্যানী। দিবাবসানের স্বর্ণালোক অঙ্গে মেখে যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন। কোথায় রয়ে গেল সঙ্গীরা? প্রভাতে তো একত্রেই যাত্রা করেছিলেন, এই কয়েক দণ্ডের মধ্যেই এত পিছিয়ে পড়বার হেতু কি?

রথের পানে চাইলেন। সারথী পুরুধান এখনও গভীর নিদ্রামগ্ন। রথের এই আকস্মিক গতিরোধেও নিদ্রাভঙ্গ হয়নি তার। ক্লান্ত পুরুধান। দুর্গম-বন্ধুর এই পার্বত্য পথে সূর্য্যোদয় সমাসন্ন সেই প্রত্যূষ কাল থেকেই ক্রমাগত রথচালনা করেছে সে। মধ্যাহ্নের যৎসামান্য বিরতি ক্লান্তি দূর করতে পারেনি তার। নিরতিশয় পরিশ্রান্ত দেখেই বেলা তৃতীয় প্রহরে তাকে অব্যাহতি দিয়ে রথরশ্মি নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন তিনি। এখনও নিদ্রাগত—জানে অশ্ববল্গা তুলে দিয়েছে যোগ্যতর হাতে, অঘটনের কোনও আশঙ্কা নেই।

যুগপৎ স্নেহে ও শ্রদ্ধায় আর একবার দৃষ্টিপাত করলেন তার পানে। সামান্য সারথী মাত্র নয়, পুরুষানুক্রমিক সেবক, পরিবারের প্রিয় ও পুরাতন বন্ধু। আপৎকালে বিবেচক সঙ্গী, প্রৌঢ়, প্রাজ্ঞ পুরুষ। এই

পুরুধান সঙ্গে না থাকলে গুটিকয় মাত্র সৈনিক সম্বল করে প্রায় অর্দ্ধেক আর্য্যাবর্ত্ত ভ্রমণের এই দুঃসাহস কি করতে পারতেন তিনি? সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপী এই পর্যটন বিঘ্নিত হতে পারতো। অথবা—

অথবা হয়তো কিছুই হত না। বাধা বিঘ্নের প্রশ্নই অবান্তর। গোটা আর্য্যাবর্ত্তে কাকেই বা ভয় করেন তিনি? হাতে শরাসন আর পৃষ্ঠে শরাশ্রয় বর্ত্তমান থাকতে সুরাসুর সংঘর্ষেই বা তাঁর সংশয় কি! দ্বাদশ বর্ষ তো অল্পকাল—শতবর্ষ পর্যটনেও কোন দ্বিধা নেই তাঁর।

দ্বাদশবর্ষ!—অন্তরে অন্তরে চাঞ্চল্য অনুভব করলেন। মাত্র এক বর্ষই তো অতিক্রান্ত হয়েছে। এখনও দীর্ঘ একাদশ বর্ষকাল বাকী। কেমন করে কাটবে দুস্তর, দুর্বহ এই সময়ভার! কবে হবে দণ্ডমুক্তি? সমাপ্ত হবে উদ্দেশ্যহীন পথ-পরিক্রমা, ফিরে যেতে পারবেন গৃহে—প্রিয়-পরিজন-প্রচ্ছায়ে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। স্বজন বিচ্ছেদের বেদনা এখনও সমান তীব্র, সমানই যন্ত্রণাদায়ক। মাতাকে মনে পড়ল তাঁর। আজন্ম দুঃখ-ভাগিনী সর্বংসহা জননী। ধৈর্য্যে ধরিত্রী সমান, তিতিক্ষায় তপস্বিনী। জন্মাবধি কখনও কি সুখী দেখেছেন তাঁকে? দেখেছেন শান্তিতে কিংবা আনন্দিত হতে? মনে পড়ে না। সর্বদা সকল সময়েই এক নিঃশব্দ কঠোর সংগ্রামে তিনি যুধ্যমানা। যে সংগ্রামের সমস্তটুকুই আবর্ত্তিত হয়েছে তাঁর সন্তানদের কেন্দ্র করে। শত-তরঙ্গিত জীবন প্রবাহ—বিপুল প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে একাকিনী পক্ষীমাতার মত শাবক রক্ষায় সদা-সতর্ক থাকতে হয়েছে তাঁকে। কখনও আকণ্ঠ দীনতায় মগ্ন, কখনও অভাবনীয় প্রতিজ্ঞায় কঠোর।

তিনি জানেন, সব পুত্রদের মধ্যে তাঁর উপরেই সমধিক নির্ভর করেন মাতা। সব পুত্রই তাঁর প্রিয়। কিন্তু আপদে বিপদে সংকট-কালে এই তৃতীয় পুত্র তাঁর প্রকৃত ভরসাস্থল। চিত্ত ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল, দৃষ্টি হল বাষ্পাচ্ছন্ন। হায় মাতঃ! প্রস্থানকালে তোমার সেই বিষাদ নিবিড় দৃষ্টি, উদ্বেগে আকুল, দুশ্চিন্তাদীর্ণ ক্লান্ত ললাট কি

কখনই শান্ত থাকতে দেবে আমাকে। প্রিয় পুত্রের এই সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ কি আরও শ্রান্ত, আরও জীর্ণ, আরও ব্যথাতুর করে তুলবে না তোমাকে।

উদ্বেগ ভ্রাতৃগণের জন্যও। প্রধানতঃ তাঁর বাহুবল নির্ভর করেই তাঁরা প্রতিষ্ঠিত। কনিষ্ঠরা বালক, এখনও মাতৃস্নেহচ্ছায়ায় লালিত। জ্যেষ্ঠাগ্রজ ধীর, বুদ্ধিমান। বিবেকবানও বটে। কিন্তু তাঁর অতি বিবেচনাশীলতাই তাঁকে নিষ্প্রভ, সর্বদা সংশয়াচ্ছন্ন চিত্ত এবং সিদ্ধান্ত-বিমুখ করে তুলেছে। মাঝে মাঝে নিবীর্য্য মনে হয় তাঁকে। মনে হয় যথার্থ ক্ষত্রিয়গুণের অভাব রয়েছে তাঁর চরিত্রে। মধ্যম মহাবল, কিন্তু জাগতিক রীতিনীতিতে অনভিজ্ঞ। রাজনীতি কিংবা কূটনীতির গূঢ় কৌশল ধরা দেয় না তাঁর বুদ্ধিতে। তিনি কি পারবেন এই দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষকাল স্বজন এবং সম্পদ রক্ষা করতে?

যথেষ্ট সংশয় আছে। কিন্তু উপায় নেই। এই বিচ্ছেদ তাঁকে বহন করতেই হবে। নিজেদেরই প্রতিষ্ঠিত নিয়মের নিগড়ে তিনি আবদ্ধ। সে নিয়ম ভঙ্গ করলে অভিযোগ কেউ করবে না, যাঁরা করতে পারতেন—সেই ভ্রাতৃগণ—বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠাগ্রজ তাঁকে সনির্বন্ধ নিষেধই করেছিলেন এই বনগমনে। কিন্তু আপন অন্তরাত্মার কাছে কি সদুত্তর দেবেন তিনি? নীতিবোধের ঘরে চৌর্য্যবৃত্তি তিনি ঘৃণা করেন, ছলনার্জিত ধর্মও কাম্য নয় তাঁর কাছে।

নিয়তি লিখন! অ-দৃষ্ট অদৃষ্ট পুরুষেরই যে এই বিধান তা তিনি বোঝেন। তথাপি হৃদয় কি অবাধ্য! নিগূঢ় বেদনার স্থানটিকেই সে লেহন করতে চায় বারংবার। অস্বীকার করবার উপায় নেই, নিজের কাছে নিজেকে উন্মোচিত করতে লজ্জাও কিছু নেই। মাতার বিচ্ছেদ, ভ্রাতৃগণের সংকটাশঙ্কা সব কিছুকে অতিক্রম করে যে যন্ত্রণা আজ দুঃসহ হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে; দূর প্রবাসের এই নিঃসঙ্গ দিনগুলি অধিকতর অসহ্য করে তুলেছে যা—তা আর একজনের স্মৃতি। সেই নারী—ভূমণ্ডলে অতুলনা—যিনি দীর্ঘ নন, অধিক খর্বও নন, যিনি কৃষ্ণা—

নিশান্তিক উষা সঙ্কাশের মত অরুণাভ যাঁর কর-পদ-তল। উত্তমা সেই রমণী রত্ন লাভ করতে ভারতের ক্ষত্রিয় সমাজ উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন একদা এবং অগণ্য-রাজন্যবর্গ শোভিত সেই সভা থেকে নিজ ভুজবলে—হ্যাঁ—সহায় নয়, সেনাবাহিনীও নয় একমাত্র আপন বাহুবলেই তিনি আয়ত্ত করেছেন তাঁকে। দুর্ভাগ্য তাঁর—অতি অল্প সময়ই সাহচর্য লাভ করতে পেরেছেন সেই নারীর। কেমন করে ভোলা যায়—কেমন করে বিস্মৃত হবেন তিনি বিদায় কালে সেই বিধুরার অশ্রু ছলো ছলো সকরুণ দৃষ্টিপাত।

মাঝে মাঝে মনে হয় এই নির্বাসন দণ্ডের প্রয়োজনও হয়তো তাঁর ছিল। মাতার বচন রক্ষার্থে পাঞ্চালীর উপরে পঞ্চ ভ্রাতার সমান অধিকার তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন বটে, তথাপি—হৃদয়ের সঙ্গে ছলনা করা যায় না। চিত্তের অগোচরে নেই কোনও পাপ। এই বিচিত্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অন্তরের অন্তস্তলে হয়তো বা আছে কোন প্রতিবাদ। বিদ্রোহের একটি স্ফুলিঙ্গ সুপ্ত হয়ে আছে। অন্যথায় সেদিন অস্ত্রাগারে কৃষ্ণা সহ যুধিষ্ঠিরকে নিভৃত বিশ্রম্ভালাপরত দেখে কেন একটি চকিত দংশনজ্বালা অনুভব করেছিলেন হৃদয়ে? মুহূর্ত পরে সেই জ্বালাই কি ক্রোধের আকারে বিস্ফোরিত হয়েছিল? বজ্রমুষ্টি অধিকতর কঠোর হয়েছিল ধনুর্দণ্ডে। ব্রহ্মস্ব অপহারক যে দস্যুদলকে বন্ধন কিংবা বিতাড়ন করলেই যথেষ্ট হত তাদের তিনি হত্যা করেছিলেন। রাজধর্মের দণ্ড-অপরাধের সামঞ্জস্য বিধি বিস্মৃত হয়ে লঘু অপরাধে তিনি কি গুরুদণ্ড বিধান করেন নি সেদিন?

জানেন না, চিন্তা করবার চেষ্টাও করেননি অর্জুন। নব স্থাপিত রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে দস্যুবৃত্তি করে প্রজাসাধারণকে উত্যক্ত করছে যারা সেই লুণ্ঠকদের জন্য তিনি কোনও মমতা বোধ করেন নি, আজও করেন না। তিনি বিশ্বাস করেন প্রজাবৎসল রাজার রাজত্বে ভয়ের কোনও স্থান নেই। স্থান নেই দস্যু, তস্কর, লুণ্ঠকের। স-ভূষণা বরাঙ্গনা মধ্যরাত্রেও যদি নিরুদ্বেগে একাকিনী পথে বিচরণ করতে পারে

তবেই তা হয়ে ওঠে প্রকৃষ্ট শাসন। ইন্দ্রপ্রস্থে সেই প্রকৃষ্ট শাসনই প্রবর্তন করতে চান তিনি। তার জন্য প্রযোজন হলে বহুবর্ষ একাদিক্রমে অস্ত্রধারণেও আপত্তি নেই তাঁর।

প্রকৃষ্ট শাসন-ধন্য তেমনই এক আদর্শ রাজশক্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন উপলব্ধি করেই নিজেকে প্রস্তুত করেছেন তিনি। একাকী এই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে না। পঞ্চভ্রাতা এক প্রাণ হয়ে চেষ্টা করলে তবেই তা সম্ভব হতে পারে। ভ্রাতৃভেদের সকল সম্ভাবনা পরিহার করে চলতে চান তাঁরা। পাঞ্চালীতে পঞ্চভ্রাতার সমান অধিকারের কারণও তাই। কৃষ্ণার অলোকসামান্য রূপরাশি যেন ভ্রাতাদের মধ্যে ঈর্ষার কারণ না হয়ে ওঠে। সেই ব্যবস্থা স্বীকার করার পরেও নিজ অন্তর বৈকল্যের আভাস উপলব্ধি করে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। অগ্রজ নন, মধ্যম নন, কনিষ্ঠেরাও নয়, নিজের জন্য এই নির্বাসন দণ্ডের ব্যবস্থা তিনি নিজেই করেছেন। পাঞ্চালীর প্রতি বিশেষ কোনও অধিকার বোধ যদি তাঁর হৃদয়ে থেকেও থাকে—এই কঠোর দণ্ডানলে দগ্ধ হোক তা। তিনি মুক্ত হন, শুদ্ধ হন।

চঞ্চল হলেন অর্জুন, অশান্ত বোধ করলেন। অন্তরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে যেন দুই হাতে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইলেন যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতির সমস্ত জঞ্জাল। নিষ্ফলা সেই চেষ্টা আরো ক্লান্ত করল তাঁকে। ক্লিষ্ট হল মুখশ্রী। প্রশান্ত ললাটে ফুটে উঠল শ্রান্ত বিদ্ধ মর্মপীড়ার সারি সারি রেখা।

হতাশ হয়ে পথ পার্শ্বের প্রস্তর পাটলে বসলেন তিনি। ভাবলেন, অবাধ্য চিত্তবৃত্তি কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না শাসন। চিন্তা কি নিরঙ্কুশ—সহস্র প্রতিরোধেও নিবৃত্ত হয় না তার অনভিপ্রেত গতি। বিচিত্র এক হাসি দেখা দিল তাঁর অধরে। মানুষ কি আশ্চর্য! চরাচরের তাবৎ বিষয় এবং বস্তুকে সে আয়ত্ত করতে চায়, অথচ স্বয়ং আপনাকে তার ভালো করে জানা নেই। সৃষ্টির রহস্য উন্মোচনে ব্যগ্র

যার অনুসন্ধিৎসা—চক্ষু ফিরিয়ে আপন অন্তরের গভীরে দৃষ্টিপাত করবার অবকাশ তার নেই কেন ?

ক্ষুব্ধ হ্রেষারবে চিন্তাভঙ্গ হল তাঁর। অধৈর্য হয়ে উঠেছে অশ্বেরা। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবিরাম দ্রুত ধাবনেই যারা অভ্যস্ত, পথের মধ্যে অকারণে নিশ্চেষ্ট এই অপেক্ষা মনোমত নয় তাদের। তারা অসন্তুষ্ট। মুহুর্মুহু বল্গা দংশন করে এবং মাটিতে খুর ঠুকে সেই অসন্তোষ প্রকাশ করছে তারা।

সস্নেহ হাসলেন তিনি। বিষণ্ণ দৃষ্টি কোমল হয়ে এল আন্তরিক অনুরাগে। অনেক দুর্গম পথের বিশ্বস্ত সঙ্গী এরা—অতিক্রম করে যেতে চায় আরও অনেক দুর্গমতম পথ। চরাচরের স্থির ও স্থাবর পটভূমিকায় অবিরাম গতির প্রতীক এই পশু। এদের তিনি ভালবাসেন। প্রাত্যহিক দিনচর্যার প্রয়োজন বলে নয়, ভালবাসেন বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো, আপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মতো। অরণ্যে, রণে এবং অবস্থা বিপাকে এদের চেয়ে বড় বন্ধু যোদ্ধার আর কে আছে ? আর স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা যাদের চরণে দিয়েছেন ঝঞ্ঝার বেগ, পথের মধ্যে যাত্রাভঙ্গ করে গতিহীন অলস অপেক্ষা তাদের মনোমত হবেই বা কেন ?

এইবার চিন্তার ছায়া ঘনাল তাঁর চোখে। সহচরেরা কোথায় ? বহুক্ষণ তো প্রতীক্ষা করলেন তিনি। একত্রে যাত্রা শুরু করে এতো পিছিয়ে পড়ল কেন তারা ? দিগন্ত বিস্তৃত বঙ্কিম সরণি বাঁকে বাঁকে দৃশ্যমান বহুদূর পর্যন্ত। যদিও পথ পার্বত্য এবং বন্ধুর, কিন্তু অগম্য নয়। তিনি নিজেও এসেছেন এই পথেই।

কুঞ্চিত চক্ষু, শরীর ঈষৎ উন্নীত করে আবার অধীর দৃষ্টিপাত করলেন পথপানে। অস্তগামী সূর্যের আরক্ত আভা এসে পড়ল তাঁর শ্যামল ললাটে। রাঙিয়ে দিল দেবতা বিনিন্দিত মুখশ্রী। বিদায় নেবার আগে ভগবান ভাস্কর যেন এই রক্তরশ্মিটি পাঠিয়ে আশীর্বাদ জানালেন তাঁকে।

পুরুষপ্রধানের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে এতক্ষণে। পথের মধ্যে রথ থামিয়ে

তাঁকে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করতে দেখে ত্রস্তে নেমে এলেন তিনি। শঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন,—কি হয়েছে কুমার? আপনাকে ব্যস্ত দেখছি কেন?

চিন্তিত কণ্ঠে তিনি বললেন,—পার্শ্বচরদের কোনও সন্ধান পাচ্ছি না পুরুধান। অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করছি, এত বিলম্ব হবার কারণ কি তাদের?

সারথীর আসনে গিয়ে বসলেন পুরুধান। অশ্বরশ্মি তুলে নিলেন হাতে। পরিচিত স্পর্শে উৎফুল্ল অশ্বেরা হ্রেষাধ্বনি করল। শান্ত আদরে তাদের আশ্বস্ত করে তিনি বললেন,—তাদের রথ মৃদুগতি। অশ্বও এত উৎকৃষ্ট নয়। দীর্ঘভ্র.ণে ক্লান্ত হয়ে পড়া স্বাভাবিক। হয়তো কিছু অধিকই পিছিয়ে পড়েছে। তার জন্য চিন্তার কিছু নেই কুমার।

অধীর কণ্ঠে তিনি বললেন,—কত মৃদুগতি রথ? তারা তো গর্দভ-বাহিত যানে আসছে না। অশ্বই তাদেরও বাহন। তাহলে এত বিলম্ব হবে কেন? আমি কি এখন আবার এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করে ফিরে যাবো তাদের সন্ধানে!

হাসলেন সারথী। সাবধানে রথ সরিয়ে রাখলেন পথের পাশে। তারপর বললেন—'এত অধীর হবেন না গাণ্ডীবি; আমাদের এই রথের রশ্মি এতক্ষণ ছিল আপনার হাতে। আর্য্যখণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রথচালক আপনি, সপ্তবিধ রথগতির সবই আপনার অধিগত। এই দক্ষতা তাদের নেই। কাজেই আপনার গতির সঙ্গে সমানতা রক্ষা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। অদক্ষ বলেই পিছিয়ে পড়েছে তারা, সে জন্য এত বিরক্ত হবার কি আছে?

—বিরক্ত নয়, আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে পুরুধান।

—দুশ্চিন্তা! বিস্মিত হলেন পুরুধান। —দুশ্চিন্তার কারণ? তারা বালক নয়. সকলেই সাহসী, সশস্ত্র এবং শক্তিমান।

'সাহসী, সশস্ত্র এবং শক্তিমান'—পুরুধান কি জানবেন, তাঁর দুশ্চিন্তার হেতুও তাই। শক্তিমান সাহসী অনুচর শ্লাঘার যোগ্য।

বিদেশে দূর পথে তাদের মূল্য অনেক। কিন্তু কখনও কখনও সেই শক্তি ও সাহসই হয়ে ওঠে অনেক অনর্থের মূল। তাঁর দুশ্চিন্তার কারণও সেইখানেই। এই অনুচরেরা শক্তিমান বলেই শক্তির প্রয়োগে সর্বদা সংযমহীন। তাদের সাহস স্পর্দ্ধার সীমা অতিক্রম করে প্রায়ই এবং প্রয়োজন থাক বা না থাক—অস্ত্র ব্যবহারকেই অস্ত্রধারণের সার্থকতা বলে মনে করে তারা। উদ্ধত এবং দুর্বিনীত এই সঙ্গীদের বহু চেষ্টা করেই সংযত রাখতে হয় তাঁকে। সসাগরা স-দ্বীপা, পর্বতমেখলা এই জম্বূদ্বীপে ব্রাহ্মণাদি-চতুর্বর্ণ ব্যতিরেকেও আরও অনেক বর্ণ, ধর্ম ও গোষ্ঠীর মানুষ বাস করে। চাতুর্বর্ণ বহির্ভূত হলেও তারা মানুষ। রাক্ষস, পিশাচ কিংবা কিম্পুরুষ নয়। তাদেরও ধর্ম আছে, সমাজ আছে, আছে পুরাতন ঐতিহ্য ও সুপ্রাচীন এক সভ্যতা। আপন আভিজাত্যের দম্ভে স্ফীত এই ক্ষত্রিয় পুঙ্গবদের সেই সত্যটা অনেক চেষ্টা করেও উপলব্ধি করাতে পারেন নি তিনি। আর্য্যক্ষেত্র প্রান্তবর্ত্তী অরণ্য পর্বতের আশ্রয়ে লালিত এই সব জনপদবাসীদের প্রতি এক অদ্ভুত উন্নাসিকতায় তারা আদ্যোপান্ত আক্রান্ত। সঙ্কুচিত চিত্তের অন্ধকার যে কত গাঢ় হতে পারে তা তিনি তখনই বুঝেছিলেন, যখন উত্তর খণ্ড পরিক্রমা শেষে কলিঙ্গভূমিতে পদার্পণ করেন। সঙ্গের ব্রাহ্মণরা প্রবল বাধা সৃষ্টি করলেন। তাঁদের মতে কলিঙ্গদেশ অপবিত্র, সেখানকার অধিবাসীরা অভিশপ্ত। ধার্মিক ব্যক্তি কলিঙ্গ সীমানা লঙ্ঘন করলে তাঁর ধর্মনাশ তথা জাতঃপাত নাকি বিধি নির্দিষ্ট।

ঈশ্বর সৃষ্ট একটি দেশ এবং জাতি অপবিত্র বা অভিশপ্ত হয় কেমন করে তা তাঁর বুদ্ধিতে আসে না। সঙ্গীদের সে কথা বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। পর্যটকের যে কোনও দেশ কিংবা জাতি সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকার প্রয়োজন নেই—সে তত্ত্বও উপস্থিত করে-ছিলেন। কিন্তু তাঁরা বোঝেননি। শাস্ত্রতত্ত্ব আর বর্ণবিভেদের জটিল কুহেলিকা জাল ভেদ করে সহজ সত্য হৃদয়ঙ্গম হয়নি তাঁদের।

ফলস্বরূপ কলিঙ্গসীমা থেকেই তাঁরা বিদায় নিলেন। স্বদেশ থেকে প্রস্থানকালে যে বিপুল সংখ্যক বেদবিৎ ব্রাহ্মণ, ভাট, সূত এবং কথক তাঁর সঙ্গ নিয়েছিলেন তাঁরা এককালে ত্যাগ করলেন তাঁকে। এমন কি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী—যাঁরা নাকি জাতি, ধর্ম, বর্ণ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কেবলমাত্র মোক্ষের আশায় অরণ্যবাস করছেন—তাঁরা পর্যন্ত প্রত্যাগমন করলেন কি এক অবোধ্য নিষেধের তাড়নায়। অবশিষ্ট রয়ে গেল মাত্র কয়েকজন সঙ্গী। এরা তাঁর আজীবনের সহচর, বিশ্বস্ত সৈনিক পুরুষ। জাতিঃপাত বা ধর্মনাশের আশঙ্কা অপেক্ষা তাঁর প্রতি ঐকান্তিক স্নেহই যাদের চিত্তে প্রবল।

এখন সেই কয়েকটি মাত্র সহচর অবলম্বন করেই ভ্রমণ করছেন তিনি। না—কোথাও বাধা পান নি। কেউ করেনি অনিষ্ট সাধন। বরং পথে পথে লাভ করেছেন অনেক সমাদর। মুগ্ধ হয়েছেন অযাচিত আশ্চর্য্য আতিথেয়তায়। দেখেছেন বহু দেশ, বিচিত্র সব মানুষ। জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। পথশ্রম দূর হয়েছে অপরিচিত কত মানুষের সুমধুর সান্নিধ্যে। তথাপি—

নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। প্রত্যক্ষ—চক্ষের সম্মুখে সদা দৃশ্যমান যে বাস্তব তাও তিনি দেখাতে পারেননি এদের। অনুদার ক্ষুদ্র চিত্তে জাগাতে পারেননি মনুষ্যত্বের প্রতি সেই শ্রদ্ধাবোধ —যার প্রভাবে দৃষ্টি হয় নির্মল, বিকশিত বুদ্ধি বিশুদ্ধ বিশ্বাসে গ্রহণ করতে পারে জীবন ও জগৎকে।

অর্জ্জুন নিজে তা পারেন। ঈশ্বর কৃপায় অদৃষ্টের এই আশীর্বাদটি জন্মমুহূর্ত্তেই বর্ষিত হয়েছে তাঁদের পঞ্চভ্রাতার শিরে। অরণ্যে তাঁদের জন্ম, শৈশব লালিত হয়েছে অরণ্যেই। অরণ্যচর মানবগোষ্ঠীর নিবিড় সান্নিধ্য তাদের জানবার সুযোগ দিয়েছে। তিনি জানেন জাতি, বর্ণ কিংবা ধর্ম বিশ্বাস তাদের যাই হোক মানবিক অর্থে তারাও কিছু মূল্যহীন নয়। শক্তিমান, স্বল্পবাক, স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয় কৃষ্ণকায় এই জাতির প্রতি কোনও অশ্রদ্ধা তাই তাঁর নেই।

কিন্তু এরা পারবে না। প্রাকৃত জন এবং জাতির প্রতি যে বিচিত্র ঘৃণা এবং তাচ্ছিল্যবোধ এদের মধ্যে সর্বদা ক্রিয়াশীল তারই প্রভাবে এরা প্রমত্ত। এইসব মানুষের প্রতি শালীন ব্যবহার করবার প্রয়োজনীয়তা এরা উপলব্ধি করে না। তুচ্ছ কারণেই সৃষ্টি হয় ঘৃণা ও বিদ্বেষ। আর সেই জন্যই এদের প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয় তাঁকে। তিনি চান না নিয়মানুগ তাঁর এই পর্যটনে কোনও বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, আন্তরিকভাবেই কামনা করেন পথ হোক নিরুদ্বিগ্ন যাত্রা শুভঙ্কর। স্বজন-সম্পর্কহীন এই দূর পরদেশে বাধা কিংবা বিগ্রহকে আমন্ত্রণ করবার বাসনা নেই তাঁর। বস্তুতঃ যৌবন সন্ধিক্ষণ অতিক্রম করে এসেও জীবনে আজও তাঁরা অপ্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য বৃহত্তর সংগ্রাম অপেক্ষা করে আছে তাঁর জন্য। অসময়ে অযথা কোনও অশান্তিতে জড়িত হয়ে শক্তিক্ষয় করতে তাই তাঁর অনীহা।

রথের উপর থেকে পুরুধান আহ্বান করলেন তাঁকে। বললেন—আর চিন্তা করবেন না কুমার। দিকচক্রবালে ধূলিরেখা দেখা যাচ্ছে। এ নিশ্চয় তাদেরই অশ্বখুরোৎক্ষিপ্ত ধূলি। তারা আসছে। তবে আপনার মত ঝটিকাগতি তাদের আয়ত্ত নয়, তাই এ স্থানে এসে উপস্থিত হতে আরও কয়েক মুহূর্ত বিলম্ব হবে। এখন দৃষ্টিপাত করুন পশ্চিম দিগন্তে। দিনকর অস্তগত প্রায়। সম্মুখে রাত্রি। তিথি কৃষ্ণা পঞ্চমী। চন্দ্রোদয়ে বিলম্ব আছে। অন্ধকার গভীর হবার পূর্বেই রাত্রিকালীন বিশ্রামের স্থান সন্ধান করা আবশ্যক।

চক্ষু ফিরিয়ে দিগন্তে দৃষ্টিপাত করলেন তিনিও। সম্মুখে ঢালু উপত্যকা অতিক্রম করে উঠে গেছে ঊর্ধ্বারোহী পার্বত্য পথরেখা। দূরে আকাশের গায়ে দক্ষ চিত্রকরের অঙ্কিত চিত্রমালার মত দুর্গ, প্রাসাদ, প্রাকার সমন্বিত এক নগরীর আভাস। জিজ্ঞাসু চক্ষে সারথীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। —আমরা নাগরাজ্য অতিক্রম করেছি অনেক দিন, সম্মুখের এই নগরীই কি তাহলে মণিপুর?

—এই মণিপুর। স্বাধীন রাজ্য। প্রজা সাধারণ গান্ধর্ববিদ্যায়

পারদর্শী বলে গন্ধর্ব দেশও বলে থাকেন কেউ কেউ। কিন্তু পথ এখনও অনেক। এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে অর্দ্ধরাত্রে নগরী প্রবেশ উচিত হবে না কুমার। অজ্ঞাত এই পররাষ্ট্রের বিধি নিষেধও আমরা কিছুই জানি না।

—রাত্রিকালে পররাজ্য প্রবেশের প্রয়োজন কি? নূতন দেশ দিবাভাগেই দেখা যাবে। আপাততঃ পথপার্শ্বের এই অরণ্য মধ্যেই বিশ্রাম শিবির স্থাপন কর তুমি। আগে অনুচররা উপস্থিত হোক। কারণ খাদ্য, বস্ত্র, শিবিরাচ্ছাদন প্রভৃতি সবই রয়েছে তাদের কাছে।

—তাদের জন্য আর অধিক অপেক্ষা করতে হবে না। ওই তাদের যান ও বাহন দৃশ্যমান। আমি নিকটেই কোথাও থেকে কোনও জলধারার কলধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। নদী কিংবা নির্ঝরিণী তীরে বিশ্রামই উপযুক্ত। আহার্য্যের অভাব নেই। সঙ্গে মধু, যবচূর্ণ ও মৃগমাংস পর্য্যাপ্ত আছে। একাধিক চষক পরিপূর্ণ আছে তাষ্ট্রী সুরায়। সুতরাং পানাহারের জন্য চিন্তা নেই।

মনে মনে হাসলেন অর্জুন। প্রৌঢ় পুরুধান কিঞ্চিত পানাসক্ত। অবিশ্রান্ত রথচালনার পরিশ্রম অপনোদনে তাষ্ট্রী অবশ্য প্রয়োজন হয় তাঁর। তবে পরিমাণ পরিমিত। সত্য এই যে তাঁর নিজের অবস্থাও অনুরূপ। পুরুধান যদি ক্লান্ত হন রথ চালনায়—দুস্তর এই পার্বত্য পথে রথ আরোহণের যন্ত্রণাও তাঁর কিছু কম নয়। ফলে দিবাশেষে কিছু উত্তেজক পানীয় তাঁরও প্রয়োজন হয়। তবে তাষ্ট্রী নয়, তাঁর প্রিয় পানীয় মাধ্বী। আরণ্যক মধুজাত অমৃত। রজতময় পাত্রে পৃথক ভাবে সংরক্ষিত থাকে কেবল তাঁরই জন্য।

অনুচরদের উচ্ছ্বাস কলরব শ্রুতিগম্য এখন। ঊর্ধ্ববাহু শূন্যে আন্দোলিত করে উল্লাস প্রকাশ করছে তারা। অশ্বখুর-ধ্বনি এবং রথচক্রের ঘর্ঘর নিনাদে স্তব্ধতা অন্তর্হিত। ধাবমান রথচক্র এবং অশ্ব-খুর থেকে উৎক্ষিপ্ত ধূলিজালে ধীরে ধীরে আবৃত হয়ে যাচ্ছে পিছনের পথরেখা, সঘন শ্যামল অরণ্য প্রকৃতির দৃশ্যরাজি।

সারথিকে আদেশ করলেন তিনি—শিবির স্থাপন কর পুরুধান। আশা করি এই গন্ধর্বভূমিতে অবস্থান আমাদের সুখকরই হবে।

—আশা করি!...হাসলেন পুরুধান। নিগূঢ় এক কৌতুকে অধরোষ্ঠ হল বঙ্কিম। বললেন,—আশাকরি গন্ধর্বেরা শস্ত্রপাণি হয়ে পশ্চাদ্ধাবন করবে না আমাদের। অতর্কিত কোন অবসরে রজ্জু-পাশধারী অপরিচিত কোনও দুর্দ্ধর্ষ বাহিনী আকস্মিক আক্রমণে অপহরণ করে নিয়ে যাবে না আপনাকে, এবং যূথপতি হারা মৃগযূথের মত আমরাও তাড়িত তথা বন্দী অবস্থায় আতিথ্য গ্রহণ করতে বাধ্য হব না দুঃসাহসিকা কোনও নায়িকার নিজ নিকেতনে।

চকিত লজ্জায় আরক্তিম হল মুখ। রক্তাভা দেখা দিল ললাট প্রান্তে। দৃষ্টি নত করলেন তিনি। নাগরাজ্য পরিত্যাগ করে আসার পর এই প্রথম সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন পুরুধান। পিতার সহচর প্রৌঢ় সারথী। তাঁর মুখে এই প্রসঙ্গ লজ্জারই উদ্রেক করে তাঁর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অভূতপূর্ব সেই অভিজ্ঞতার স্মৃতিতে পুলক শিহরণ সৃষ্ট হল সর্বাঙ্গে। নিরূপমা সেই রমণীকে স্মরণ করলেন তিনি। সুন্দরী, সুগ্রীব, সুধাংশু হাসিনী। নারীবর্জিত এই দূরযাত্রার নিঃসঙ্গ কয়েকটি দিনরাত্রি তিনি পূর্ণ করে দিয়েছেন তাঁর আত্মনিবেদনের অমৃতে। যদিও তাঁর পন্থাটি ছিল কিঞ্চিত আসুরিক। প্রেমাস্পদকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে প্রণয় নিবেদনের এমন বিচিত্র রীতি নারীকুলে আর কোথাও আছে বলে জানা নেই অর্জ্জুনের। তথাপি সকৃতজ্ঞ অন্তরে বার বার স্মরণ করলেন সেই নারীকে। উন্মোথিত পুরুষবক্ষ স্পন্দিত হতে লাগল বিধুর বেদনাময় স্নেহে।

সানুচর সংকীর্ণ বনপথে প্রবেশ করলেন তিনি।

সূর্য্য অদৃশ্য হয়েছেন দূর পর্বতের অন্তরালে। অন্তিম কয়েকটি রশ্মি এখনও আকাশে বর্ত্তমান। কুলায় প্রত্যাগত বিহঙ্গ-বলাকার কলকাকলীতে বনভূমি মুখর। সমগ্র উপত্যকা ভূমি ব্যাপ্ত করে ঘনায়িত হচ্ছে শান্ত, ধূসর-বিষণ্ণ সন্ধ্যা। অন্ধকার একত্রিত হচ্ছে,

কুণ্ডলিত হচ্ছে তরুশাখায়, বৃক্ষপল্লবে, অরণ্যের জটিল লতা-বিতানে। বনভূমির মুখ ঢেকে গেছে গাঢ়কৃষ্ণ অবগুণ্ঠনে।

অর্জ্জুন জানলেন না, কেউ কল্পনাও করতে পারল না। সেই অন্ধকারে, প্রায়ান্ধ সেই অরণ্যের তরুশাখায়, বৃক্ষ কোটরে, পল্লবান্তরাল এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পাথরের আড়াল থেকে উৎকণ্ঠিত অনেক চক্ষু তীব্র কৌতুহল এবং দ্যুতিময় অনুসন্ধিৎসায় চেয়ে রইল তাঁদের দিকে।

গন্ধর্ব রাজ্য মণিপুরের সীমান্ত সেনারা শৈথিল্য জানে না। অসতর্কতার কোন মার্জনা নেই তাদের অধিনায়িকার অধিকারে।

॥ ২ ॥

চিন্তাকুঞ্চিত মুখে দূতের পানে চাইলেন চিত্রাঙ্গদা। ঈষৎ অস্বস্তির ছায়া ঘনাল তাঁর চক্ষে। জিজ্ঞাসা করলেন,—তাঁদের উদ্দেশ্য কিছু জানতে পেরেছো?

মাথা নাড়ল দূত। কিছুই না। গুটিকয় পার্শ্বরক্ষী মাত্র সঙ্গে নিয়ে মণিপুর সন্নিহিত অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছেন রথাশ্ব-শস্ত্র-সজ্জিত এই বিদেশী পুরুষ। এর বেশি আর কিছুই এখনও জানে না সে।

বিরক্ত হলেন চিত্রাঙ্গদা। বিরাগপূর্ণ দৃষ্টিপাতে তার আশঙ্কা উদ্রেক করে রুষ্টকণ্ঠে বললেন,—মণিপুরের সীমান্ত সেনাদল কি এতই অপদার্থ! বিনা সংবাদে রাজ্যসীমায় প্রবেশ করেছেন যে অপরিচিত আগন্তুক—তাঁর বিস্তৃত পরিচয় সংগ্রহ করাই যে তাদের প্রথম কর্ত্তব্য সে কথা কি তাদের অজ্ঞাত? অন্ততঃ তাঁর পরিচয় অনুমান করা তোমাদের উচিত ছিল। ক্ষত্রিয়দের কৌল পরিচয় তাঁদের ধ্বজাগ্রে লেখা থাকে। চন্দ্র চিহ্নিত পতাকা একমাত্র আর্য্যাবর্ত্তের ভরত বংশীয় ক্ষত্রিয়রাই বহন করেন। চন্দ্র তাঁদের কুলদেবতা। ভারতখণ্ডের অন্যতম প্রধান প্রতাপী বংশ এরা। আর এই পুরুষ—নিমেষেরজন্য নত হল তাঁর আঁখি পক্ষ্ম—দীর্ঘকায়, দীর্ঘ বাহু, শ্যামল শরীর, স্বোপার্জিত শৌর্য্যে যিনি সর্বদা দীপ্যমান—ক্ষত্রিয় কুলগৌরব সেই সব্যসাচী অর্জুনকে কে না জানে! পরলোকগত নরপতি মহাত্মা পাণ্ডুর ইনি তৃতীয় সন্তান।

তিরস্কারে বিবর্ণ হল দূত। নতশিরে প্রার্থনা করল পরবর্ত্তী নির্দ্দেশ।

চিত্রাঙ্গদা বললেন,—করবার কিছুই নেই, শুধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখ তাঁর গতিবিধির উপর। তিনি কেন এসেছেন তা আমরা জানি না। তাঁর

অন্তরস্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও আমরা অনবগত। হয়তো উদ্দেশ্য কিছুই নেই, হয়তো শুধুই ভ্রমণার্থে—অথবা…নীরব হলেন চিত্রাঙ্গদা। ভ্রূ কুঞ্চিত করে চিন্তা করলেন কয়েক মুহূর্ত। বললেন, যদিও বিনা কারণে শুধু ভ্রমণের জন্যই ভ্রমণ ব্রাহ্মণ কিংবা সূতেরাই করে থাকেন সাধারণতঃ, ক্ষত্রিয়দের তেমন প্রিয় নয় তা—তথাপি কারণ যাই হোক, উদ্দেশ্য কিছু থাক বা না থাক, তাঁর বিরক্তি উৎপাদন যেন কেউ না করে। তিনি আতিথ্য বা আশ্রয় প্রার্থনা করেন নি, তত্রাচ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য সানুচর কোনও বিপাকে যেন না পড়েন, এবং অরণ্যাশ্রিত হলেও খাদ্য পানীয় কিংবা আর কোনও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাবে কোনও অসুবিধা যেন তাঁদের না হয়। অযাচিত হলেও তাঁরা আমাদের অতিথি সেকথা স্মরণ রাখবে তোমরা।

—খাদ্য পানীয় কি তাঁদের পৌঁছে দেওয়া হবে রাজ ভাণ্ডার থেকে?

—মূর্খ!—তিরস্কার করলেন চিত্রাঙ্গদা। ক্ষত্রিয়রা কখনই দান প্রতিগ্রহ করেন না। এঁরা ব্রাহ্মণ কিংবা যতি নন, বনবাসী হলেও ক্ষত্রিয় সন্তান। কুলাচার থেকে কখনই ভ্রষ্ট হবেন না। এঁদের কিছু দিতে হলে উপহার স্বরূপ পাঠাতে হয়। কিন্তু অযাচিত উপহার কেনই বা পাঠাবে মণিপুর? আমার বিশ্বাস তাঁদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী তাঁরা নিজেরাই সংগ্রহ করে নিতে পারবেন নগর বিপনী থেকে ক্রয় করে, কতক বা মৃগয়া মাধ্যমে। যদি তা না পারেন—তখন অন্য কর্ত্তব্য চিন্তা করে দেখা যাবে।

—মণিপুর অরণ্যে পশুবধে রাজকীয় বিধি নিষেধ আছে কিছু কিছু। সে নিষেধ কি তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হবে?

—অবশ্যই জানিয়ে দেওয়া হবে। স্ত্রী পশু, সদ্যোজাত বৎস, গর্ভবতী হরিণী এবং একমাত্র যূথপতি অবধ্য। বসন্ত সমাগমে দূর দেশাগত পক্ষীদলে শর সন্ধানও নিষেধ। আপামর মণিপুরবাসী এই নিষেধ মান্য করে থাকে; তাঁদেরও তা করতে হবে। মণিপুর অরণ্যে নিরাপদ জল-সনাথ এবং পুষ্প-পাদপ-ছায়াশ্রিত রমণীয় অনেক স্থান আছে।

যতদিন ইচ্ছা নির্বিঘ্নে সেখানে বাস করুন তিনি। বনজ ফলমূল, মধু এবং মধুচ্ছিষ্ট যত ইচ্ছা আহরণ করতে পারেন। কেউ তাঁদের বাধা দেবে না, শান্তি ভঙ্গও করবে না। সীমান্ত সেনাপতির প্রতি এই আমার নির্দেশ।

—সীমান্ত সেনাধিপতি মিহির ভদ্রকে আমি এই নির্দেশ জানিয়ে দেব দেবী।

নমস্কার নিবেদন করে বিদায় হল দূত। চিন্তিত চক্ষে কিছুক্ষণ তার গমন পথের দিকে চেয়ে রইলেন চিত্রাঙ্গদা। তাঁর ললাটের মেঘ তখনও অনপসারিত। এই আগন্তুক দল নিতান্ত অপ্রত্যাশিত নন তাঁর কাছে। নাগ রাজ্যবাসিনী নাগেন্দ্র ঐরাবত বংশীয়া কৌরব্য নাগের কন্যা উলূপী তাঁর সখী। সখ্যসূত্রে তিনি তাঁকে ইরাবতী নামে সম্বোধন করে থাকেন। সেই ইরাবতী কয়েকদিন পূর্ব্বে সংবাদ পাঠিয়েছেন তাঁকে। নাগরাজ্য থেকে মণিপুর বহুদূর। বিধবা, অপত্যবিহীনা সখী ইরাবতী বাস করেন নাগরাজ্যে দুর্গম অরণ্য পর্বতের সুদূর ব্যবধানে। অতএব দুই সখীর মধ্যে সংযোগসূত্র রক্ষা করবার জন্য কয়েকজন দ্রুতগামী বার্ত্তাবাহক তাঁদের আছে। ইরাবতী প্রেরিত তেমনই এক বার্ত্তাবাহী দূত সম্প্রতিই সংবাদ দিয়ে গেছে—নাগখণ্ড ত্যাগ করে মণিপুর অভিমুখে প্রস্থান করেছেন অর্জুন। বিলম্বে হোক অথবা ত্বরায়—মণিপুরে তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে।

দর্শন! ললাট কুঞ্চিত হল তাঁর। অস্বস্তি বোধ করছেন তিনি। অন্তরের অন্তঃস্তলে আভাস পাচ্ছেন কি যেন এক সমস্যার। সত্য এই যে এই মুহূর্ত্তে মণিপুরে অর্জুন দর্শন না দিলেই বোধকরি তিনি সুখী হতেন। ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তবর্ত্তী, হিমাদ্রির উত্তরণ ভূমিতে অবস্থিত এই তাঁর ক্ষুদ্র রাজ্য। এক দিকে অরণ্য, অন্য প্রান্তে প্রাকৃতিক পর্ব্বত প্রাচীরে সুরক্ষিত গন্ধর্ব জাতির বাসভূমি এই মণিপুর। এত-কাল অনার্য্য আরণ্যক বোধে আর্য্যখণ্ডের অধিবাসীরা তাঁদের উপেক্ষাই করে এসেছেন। রাক্ষস, আসুর কিংবা কিম্পুরুষদের মত গন্ধর্বরাও

ব্রাত্য—এই ছিল তাঁদের অভিমত। বস্তুতঃ ভারতখণ্ডের পূর্ব্ব এবং উত্তর পূর্ব্বাঞ্চল সম্বন্ধে আর্য্যজাতির অভিজ্ঞতা তেমন নেই। এখানে গমনাগমনও তাঁরা করেন না। সেজন্য কোনো অভিযোগ নেই তাঁর। বরং এই বীতরাগকে মণিপুর অধিবাসীর সৌভাগ্যের লক্ষণ ভেবেই স্বস্তিতে ছিলেন তিনি এতকাল। কারণ—

সেই কারণ—চিন্তাই দুশ্চিন্তা তাঁর। আর্য্যজাতির আচার আচরণের প্রতি তেমন শ্রদ্ধা তাঁর নেই। অত্যন্ত অহঙ্কারী তাঁরা, সম্ভবতঃ হিংস্রও। কারণ তিনি জানেন যুদ্ধকে এঁরা ধর্ম মনে করেন। হত্যা তাঁদের বিলাস, এবং নিজ রাজ্যের সমৃদ্ধি বর্দ্ধনে পররাজ্য গ্রাস তাঁদের মতে গৌরবজনক। ভারতখণ্ডের সব রাজাই চক্রবর্ত্তী সম্রাট হবার স্বপ্ন দেখেন এবং সামান্য মাত্র শক্তি সঞ্চয় করতে পারলেই যাত্রা করেন দিগ্বিজয়ে। কৃষিকর্ম কিংবা বাণিজ্য বিকাশ অপেক্ষা পররাজ্য লুণ্ঠন করে রাজকোষের শ্রীবৃদ্ধি সাধনই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। পরিণামে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত সর্বদা সংঘাত-জর্জর হয়ে আছে এই রাজগণের দ্বন্দ্বে। সর্বদাই পরস্পরকে আক্রমণ করছেন তাঁরা। দুর্বল নৃপতিগণ নিয়তই উৎপীড়িত এবং হতমান হচ্ছেন সবলতর কোনও নরপতির আক্রমণে। লুণ্ঠিত হচ্ছে তাঁদের ভূমি, বিত্ত, পশু ও রাজকোষ। রাজমহিষী দাসীত্ব বরণ করছেন। সুন্দরী রাজকন্যাদের পরিণতি ঘটছে উপপত্নীত্বে। এইমাত্র যিনি ছিলেন স্বাধীন রাজা পর মুহূর্ত্তেই বিজেতা নৃপতির আজ্ঞানুবর্ত্তী অনুচরত্ব স্বীকার করতে হচ্ছে তাঁকে।

স্বস্তির কথা এই কলহ সমতল ভূমিতেই সীমাবদ্ধ আছে এখনও। হিমাদ্রি তথা বিন্ধ্যাচলের ছায়াশ্রিত রাজ্যগুলি এখনও নিরাপদ।

কিন্তু এই নিরাপত্তা আরও কতদিন অক্ষুন্ন থাকবে তা তিনি জানেন না। বিশেষতঃ মণিপুর এখন সমৃদ্ধ। সহজে করায়ত্ত হয়নি এই সমৃদ্ধি। শক্তিমান, সাহসী, কঠোর পরিশ্রমী তথা কৃত-নিশ্চয় এক জাতির সুদীর্ঘ কৃচ্ছ্রসাধনার ফল এই সার্বিক শ্রী। কিন্তু যেহেতু প্রত্যেক ক্রিয়ারই কিছু প্রতিক্রিয়া থাকে—সেই হেতু রাজ্যের সম্পদ

এবং শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে, বর্দ্ধিত হয়েছে দায়িত্ব-ভার। সুরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হয়েছে মণিপুরের, পরশ্রীকাতর, পরস্বাপহারক, লুণ্ঠনপ্রিয় রাজশক্তিগুলির প্রতি রাখতে হয়েছে সতর্ক দৃষ্টি।

কিন্তু এখন—অকস্মাৎ সেই আর্য্যখণ্ডেরই এক রাজপুত্রের এই অযাচিত আগমন যুগপৎ সন্দিগ্ধ এবং চিন্তিত করে তুলেছে তাঁকে। কারণ কি এই দীর্ঘ দুষ্কর পথ যাত্রার? কেন এসেছেন তিনি?

কারণের একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত অবশ্য সখী ইরাবতীর বার্ত্তায় আছে। তা যেমন বিচিত্র, তেমনই অবিশ্বাস্যও বটে।

পুরুষের বহু নারী সম্ভোগ আর্য্যজাতির মধ্যে নিন্দনীয় নয়, বরং তা শ্লাঘাকর। ইচ্ছামত একাধিক পত্নী, উপপত্নী ও দাসী গ্রহণ করতে পারেন তাঁরা। অসংখ্য রমণী পরিবৃত অন্তঃপুর রাজগণের গৌরব বর্দ্ধন করে। যে রাজা যত প্রতাপী, তাঁর অন্তঃপুরের পরিধি তত বিস্তৃত। কিন্তু নারীরা একমাত্র ভর্ত্রীভাগিনী। বিধবার পুনর্বার পতিগ্রহণ প্রচলিত নেই। মৃত শবদেহ আলিঙ্গন করে চিতায় মৃত্যুই তাঁর বিধেয়। অন্যথায় আজীবন ভোগসুখ বিরহিত, কঠোর ব্রহ্মচর্য ব্রতধারিণী হয়ে ব্যতীত করতে হবে তাঁকে। বিষয় সম্পদ অধিকারে থাকলেও জাগতিক সম্ভোগ নিষিদ্ধ। ভোগার্থিনী বিধবা অপবাদ এবং কলঙ্ক-ভাগিনী হবে—এই ঋষির বিধান।

আশ্চর্য্য এই যে এক-পাতিব্রত্যের সেই দেশে পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভ্রাতা সম্মিলিতভাবে বিবাহ করেছেন পাঞ্চাল নন্দিনী কৃষ্ণাকে। বহু দেশ পর্যটনকারী কথা-কুশলী এক ভাট মুখে তিনি শুনেছিলেন সেই বিবাহের কাহিনী। স্বয়ংবর সভায় এক দুরূহ লক্ষ্য বিদ্ধ করে তৃতীয় পাণ্ডব পার্থ লাভ করেছিলেন এই বালাকে। কিন্তু মাতা কুন্তির অনবধান এক নির্দেশ উপলক্ষ করে, প্রধানত ভ্রাতৃভেদ ভয়ে—কারণ কৃষ্ণার রূপ লাবণ্য দেখে পঞ্চ ভ্রাতাই নাকি সম্মোহিত হয়েছিলেন একসঙ্গে—অগ্রজ যুধিষ্ঠির সিদ্ধান্ত করলেন তাঁরা সম্মিলিত ভাবেই বিবাহ করবেন দ্রুপদ কন্যাকে।

পাঞ্চাল নরেশ যজ্ঞসেন প্রথমতঃ সম্মত হননি এই অশাস্ত্রীয় প্রস্তাবে। অতঃপর—

অতঃপর অচিরে ঘটনাস্থলে উদিত হলেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। ভারতখণ্ডের লোকমান্য ঋষি তিনি। সম্প্রতি বেদ বিভাজন করে খ্যাতি ও কীর্তির স্বর্ণ শিখরে উন্নীত হয়েছেন। জাগতিক সব সমস্যার সবল সমাধান তাঁর সংগ্রহে সর্বদা বর্তমান থাকে।

দ্রৌপদীর পূর্বজন্মবার্তা সহ অদ্ভুত অননুভবযোগ্য এক যুক্তি প্রয়োগে তিনি প্রমাণ করলেন পাঞ্চালীর পঞ্চপতি তাঁর জন্মান্তর-জাত কর্মফলেই নির্দিষ্ট। অতএব—

অতএব যদিও ন্যায় ও ধর্মমতে দ্রুপদকুমারী অর্জুনেরই ভার্যা হতে পারেন—তথাপি তাঁর পূর্বজন্মার্জিত কর্মফলে, এবং প্রত্যক্ষতঃ ব্যাসের বিধানে এককালে পঞ্চ ভ্রাতার পত্নীত্বে আবদ্ধ হতে হল তাঁকে।

মৃদু—অতিমৃদু, কিন্তু তীক্ষ্ণ এক হাস্যরেখা দেখা দিল তাঁর অধরে। ধন্য ঋষিগণ! জনকল্যাণে, সমাজের প্রয়োজনে অসংখ্য বিধি বিধান সৃজন করেন তাঁরা। কিন্তু তারপর, অন্যতর কোন অবস্থায়, স্থান কাল পাত্র ভেদে, পরিস্থিতির প্রয়োজনে সম্পূর্ণ বিপরীত আর এক বিধি সৃষ্টি করতেও বিলম্ব হয় না তাঁদের। শুধু চিন্তা করেন না—সাধারণ মানুষের হৃদয়ে কি প্রতিক্রিয়া হয় সেই পূর্বাপর সংযোগবিহীন বিপরীত শাস্ত্রতত্ত্বের। প্রাকৃতজন এতে কেবল বিভ্রান্তই হয় না, বিড়ম্বনাও ভোগ করে।

অথবা—চিন্তা করলেন তিনি—মানুষের প্রয়োজনেই তো ধর্ম। শাস্ত্র সেই ধর্মের ব্যাখ্যাতা মাত্র। সত্যের ভিত্তি কল্যাণের গভীরে নিহিত। শাস্ত্র সেই মহত্তর মঙ্গলেরই স্বরূপ।

পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি অনেক সমস্যা বহন করে আনে জীবনে। শাস্ত্র এবং ধর্মের মধ্যেই সে সব সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে চায় মানুষ। তাই ধর্মতত্ত্ব কিংবা শাস্ত্রনীতিকেও মানবিক প্রয়োজনের দায় স্বীকার করে নিতেই হয়। মানুষের সদসৎ, শুভাশুভ সব কিছুকে

ধারণ করে যে—এবং মানুষ যাকে ধারণ করে রাখে তার চিন্তা, বুদ্ধি এবং চৈতন্য দ্বারা—সেই ধর্ম।

তাহলে আর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অনুচিত কি করেছেন? পাণ্ডব ভ্রাতৃগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং সৌহার্দ্য রক্ষা করাই যখন তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র উপায়, তখন সেই সৌহার্দ্যের সকল বিঘ্ন বিদূরিত করাই তো তাঁদের পক্ষে একমাত্র ধর্ম। চিত্রাঙ্গদা শুধু আশ্চর্য্য বোধ করেন এই ভেবে যে পঞ্চ ভ্রাতার কল্যাণের জন্য অনিবার্য্য এই ব্যবস্থাটিকে সহজ সত্যের আকারে কেন উপস্থিত করতে পারলেন না ব্যাস? পাঞ্চালীর কর্মফল, তাঁর পূর্ব জন্মকথা ইত্যাদি অদ্ভুত ও জটিল তত্ত্বের অবতারণা কেন করতে হল তাঁকে।

সম্ভাব্য সেই ভ্রাতৃবিরোধ নিবারণ কল্পেই নিজেদের মধ্যে পত্নী সহবাস সম্বন্ধীয় এক নিয়ম সংস্থাপন করেছেন পঞ্চপাণ্ডব। পাঞ্চালী যখন যে ভ্রাতার সঙ্গে বাস করবেন তখন তিনি ভিন্ন অন্য কোনও ভ্রাতা দর্শন করবে না পত্নীকে, তাঁর আবাসেও প্রবেশ করবে না। করলে দ্বাদশ বর্ষ নির্বাসন দণ্ড ভোগ করতে হবে তাঁকে। অর্জুন সে নিয়ম ভঙ্গ করেছেন এবং তারই ফল স্বরূপ এই তাঁর নির্বাসন বাস।

অকস্মাৎ কেমন যেন কৌতুক বোধ করলেন চিত্রাঙ্গদা। কি বিচিত্র নিয়ম! পঞ্চ ভ্রাতার এক পত্নীতে নিষেধ নেই, নিষেধ কেবল অপর ভ্রাতৃ-সহবাসে তাঁকে দর্শন করলেই। আজীবন এই বিচিত্র নিয়ম রক্ষা করা কেমন করে সম্ভব হবে তাঁদের পক্ষে?

স্ত্রীলোকের বহুপতিত্ব পৃথিবীতে নূতন কিছু নয়। পার্বত্য অনার্য্য সমাজে এ বিধি প্রচলিত আছে চিরকাল। পারিবারিক সম্পদের বিভাজন এবং সেই উপলক্ষে আত্মীয় বিরোধ প্রতিরোধে একাধিক ভ্রাতা সম্মিলিতভাবে বিবাহ করে থাকেন এক নারীকে। কিন্তু সঙ্গে বিধবা বিবাহও প্রচলিত আছে এবং পতি বিয়োগের পর বৈধব্যের কঠোর কোনও অনুশাসনও আরোপিত নেই অনার্য্য নারীদের উপর।

কিন্তু আর্য্য সমাজে এ পদ্ধতি ঘৃণিত। বিধবা নারীর বিবাহে

অধিকার নেই, বরং পতি বিয়োগের পর জাগতিক সুখ সম্ভোগে নিস্পৃহ হয়ে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে হয় তাঁদের। বিচিত্র তথা কৌতুহলোদ্দীপক এক কাহিনী আর্য্যাবর্ত্ত প্রত্যাগত এক ভাট মুখে শুনেছিলেন তিনি।

জন্মান্ধ ঋষি দীর্ঘতমার পত্নী বিদ্রোহিনী হয়েছিলেন একদা। ক্রমাগত সন্তান প্রসব এবং ঋষিসহ সেইসব পুত্রকন্যাদের ভরণ পোষণে ক্লান্ত হয়ে কটূক্তি কলহ করে গৃহত্যাগে বাধ্য করেছিলেন ঋষিকে। ঋষিপত্নী যদি স্বয়ং গৃহত্যাগ করতেন তাহলে বোধকরি এতটা দোষাবহ হত না। কিন্তু গৃহ পরিবার তথা স্বয়ং তাঁরও প্রভু স্বামীকেই তিনি বিতাড়িত করেছিলেন।

পতিদ্রোহের কোনও মার্জনা নেই আর্য্য সমাজে। ক্রুদ্ধ ঋষিসমাজ পতিব্রত্যের এক নূতনতর নিয়ম প্রবর্ত্তন করলেন এর পর। কুৎসিৎ, অক্ষম, রোগী, বিকৃত বুদ্ধি, অঙ্গহীন—এমন কি ভর্ত্তা হয়েও ভার্য্যার ভরণ-পোষণে অপারগ হলেও পতিই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি। যে কোনও ক্ষেত্রেই নিঃশর্ত্ত আনুগত্যে একনিষ্ঠ থাকতে হবে নারীকে। অন্যথায় তিনি পতিতা হবেন। পতিহীনা স্ত্রীলোকের জাগতিক সমস্ত সুখ-সম্ভোগ নিষিদ্ধ হল সেদিন থেকে। সে নিষেধ অমান্য করলে সমাজে ধিক্কৃতা—এমন কি পরিত্যক্তাও হতে পারেন তিনি।

একের অপরাধে সমস্ত নারী সমাজকে দণ্ডিত করেছেন ঋষিসমাজ। জন্মান্ধ ঋষির বিবাহ বাসনা কিংবা ক্রমাগত সন্তান উৎপাদনের প্রবৃত্তিও বিস্ময়কর। সুদীর্ঘকাল যে নারী নীরবে বহন করেছেন দুর্বহ সংসার-ভার, তাঁর একদিনের অসহিষ্ণুতার এত কঠোর দণ্ড প্রায় অবিচার তুল্য বলেই মনে হয় চিত্রাঙ্গদার।

পাতিব্রত্য প্রতিষ্ঠিত থাকে পতিপত্নীর পারস্পরিক প্রণয় ও বিশ্বাসের ভিত্তির উপরে। বিধি বিধানের বিষম নিগড়ে আবদ্ধ করে নারী জাতির উপর তাকে আরোপ করলে পুরুষের বলদর্পই প্রকাশ পায়; পতিপত্নীর সম্পর্ক সেখানে অবাস্তর হয়ে পড়ে।

চিত্রাঙ্গদা কৌতুক বোধ করেন দ্রৌপদীর কথা ভেবে। ঈশ্বর না করুন পাণ্ডবদের পঞ্চ ভ্রাতার কোনও এক ভ্রাতা যদি অকস্মাৎ কালগ্রস্ত হন—কি করবেন পাঞ্চালী তখন?

সনাতন ধর্মের নিয়ম অনুসারে ব্রহ্মচর্য্যই তখন তাঁর বিধেয়। কিন্তু একই সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য এবং অন্যান্য স্বামীদের তুষ্টি বিধান কি করে সম্ভব হবে তাঁর পক্ষে!

পরমুহূর্ত্তেই মনকে শাসন করলেন চিত্রাঙ্গদা। ছিঃ! একি অপচিন্তা! অনধিকার-চিন্তাও বটে। পৃথিবীতে কত মানুষ আছে, কত জাতি, কত সমাজ। তাঁদের সামাজিক রীতিনীতি তাঁরা নিজেরা জানেন। বিশেষতঃ আর্য্য নারীরা নিজেরাই যখন স্বীকার করেছেন এই ব্যবস্থা, তখন অনর্থক তিনি কেন পাণ্ডবদের মৃত্যু চিন্তা করেন! পঞ্চপাণ্ডব দীর্ঘায়ু লাভ করুন, দ্রৌপদী হন চির আয়ুষ্মতী। বৈধব্য যেন তাঁকে স্পর্শও না করে। সর্বভূতভগবান পিনাকপাণির কাছে তাঁদের মঙ্গল প্রার্থনা করবেন তিনি। কিন্তু—

কিন্তু এখন প্রশ্ন অর্জুন। তিনি এসেছেন।

হয়তো সত্যই তাঁর উদ্দেশ্য পর্যটন।

বিধাতা সৃজিত এই বসুমতীতে স্বেচ্ছামত ভ্রমণের অধিকার সকলেরই আছে। দর্শনার্থী কোনও দেশ কিংবা রাষ্ট্রগণ্ডীতে আবদ্ধ হতে পারেন না। অতএব চলে যেতে অবশ্যই বলা যায় না তাঁকে।

কিন্তু চিত্রাঙ্গদা উদ্বিগ্ন। তিনি চান না গন্ধর্ব সেবিত তাঁদের এই বাসভূমিতে আর্য্যজাতির আগমন বৃদ্ধি পাক। মনিপুরের শ্রী এবং সমৃদ্ধির খ্যাতি প্রচারিত হোক ভারতখণ্ডে।

ইরাবতী তাঁর এ মনোভাব জানেন। জানেন বলেই অর্জুনের সম্ভাব্য আগমন সংবাদ পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছেন তাঁকে। পাণ্ডবের গুণগান করেছেন বিবৃত করেছেন—তাঁর শৌর্য্য ও সদাচরণের অসংখ্য উদাহরণ এবং মনিপুর বাসকালে তাঁর সুখ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখতে সনির্বন্ধ অনুরোধও জানিয়েছেন।

অনুরোধ জানাবার কারণও আছে। উপযাচিকা ইরাবতী সম্প্রতি বরণ করেছেন এই পুরুষকে। পরিহাস-প্রগাঢ় মুখে আবার হাসলেন চিত্রাঙ্গদা। দুঃসাহসিকা ইরাবতী! বন-ভ্রমণরত অর্জুনকে দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন।

যে কোনও রমণী পুরুষের সম্বন্ধে তার মুগ্ধতা গোপন করে রাখতেই অভ্যস্ত। বড় বেশি হলে প্রিয়সখী বা নিতান্ত অন্তরঙ্গ জন ভিন্ন প্রণয় কথা প্রকাশ করে না নারী।

কিন্তু ইরাবতী—ইরাবতীই। বাঞ্ছিত পুরুষের আশায় অন্তহীন প্রতীক্ষা, হা-হুতাশ কিংবা অশ্রুমোচনে তাঁর আস্থা নেই। নারী হয়েও তিনি পুরুষকারে বিশ্বাসী। অতএব স্বয়ং উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। শস্ত্রধারী আপন বিশ্বস্ত রক্ষীদলকে নিয়োগ করলেন অর্জুনের অনুসরণে। তারপর একদা—নিরস্ত্র পার্থ যখন নিঃশঙ্ক চিত্তে স্নান করছিলেন, ধনুর্বাণ রজ্জুপাশধারী নাগ সেনা সহ আক্রমণ করলেন তাঁকে। প্রতিরোধ করা দূরস্থান, প্রতিবাদের অবকাশও পাননি পাণ্ডব। নিতান্ত নিরুপায়ের মতই বন্দী অবস্থায় নীত হয়েছিলেন ইরাবতীর নিভৃত নিবাসে।

ইরাবতী জানিয়েছেন—আত্ম সমর্পণ করেছেন তিনি। পার্থ গ্রহণ করেছেন তাঁকে। অনাস্বাদিত-পূর্ব সুখের সম্ভাবনা সূচিত হয়েছে তাঁর জীবনে। পাণ্ডবের প্রসাদে তিনি সন্তান সম্ভবা। তাঁর ব্যর্থ জীবনে বাৎসল্যের অমৃত নির্ঝর স্ফুরিত হবে অচিরে।

তিনি শ্রেয়ো লাভ করুন। পতিবিয়োগ বিধুরা সন্তানহীনা সখী ইরাবতীর জন্য গভীর বেদনা অনুভব করেন চিত্রাঙ্গদা। দুর্দৈবগ্রস্ত জীবন তাঁর। প্রাপ্ত যৌবনে সুযোগ্য এবং স্বগোষ্ঠীভুক্ত সুপাত্র সন্ধান করেই তাঁর বিবাহ দিয়েছিলেন তাঁর পিতা কৌরব্য। দুরদৃষ্ট ইরাবতীর। বিবাহের অল্পকাল পরেই নাগকুলের চির বৈরী পন্নগেন্দ্র গরুড়ের আক্রমণে গতায়ু হন তাঁর স্বামী। নিহত হন না বলে তিনি আত্মবলি দিয়েছিলেন বলাই উচিত। শোনা যায় অপ্রাপ্ত বয়স্ক

কোনও এক নাগ শিশুকে রক্ষা করতেই আত্মাহুতি দিয়েছিলেন তিনি, এবং মৃত্যুর পূর্বে সকাতর অনুনয় করেছিলেন পন্নগপতিকে—তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যেন সমাপ্তি ঘটে এই বংশানুক্রমিক শত্রুতার।

শ্বাস ত্যাগ করলেন চিত্রাঙ্গদা। তিনি জানেন তা হয়নি। আজও নাগ এবং পন্নগ গোষ্ঠী বিবদমান। পরস্পর অনিষ্ট সাধনে সর্বদা সচেষ্ট তারা। বেদনা বোধ করেন তিনি। যুগান্ত পূর্বের সেই কদ্রু-বিনতার দ্বেষ উপলক্ষ্য করে আর কতকাল অনুষ্ঠিত হবে এই হত্যা যজ্ঞ! রক্তপাতের কি শেষ নেই? হিংসা কি অন্তহীন হয়ে প্রসারিত করবে তার শাখা প্রশাখা; পুরুভূজের মত মূল প্রোথিত করবে এই দুটি জাতির মর্ম মজ্জার গভীরে? শেষ শোণিত বিন্দুটি শোষণ না করা পর্যন্ত কি মুক্তি নেই? একেবারে সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত নখরে দন্তে যুদ্ধ করে যাবে এই দুই জাতি।

তিনি জানেন না এ প্রশ্নের উত্তর কোথায়। তিনি জানেন না বংশগত এই বৈরীতার অবসান কখন এবং কিভাবে।

সদ্য যৌবনে স্বামীহারা, বিধবা ইরাবতী অতি দুঃখেই দিন যাপন করে আসছিলেন এতকাল। তাঁর পিতা কৌরব্য তাঁকে প্রাসাদ, রত্নরাজি, দাসদাসী এবং নিজস্ব রক্ষী দল দিয়েছেন, কিন্তু সুখী করতে পারেন নি। চির বিষণ্ণ, ব্যথিত কন্যার মুখে হাসি দেখবার সৌভাগ্য হয়নি তাঁর। ইচ্ছা করলেই পুনর্বার পতি গ্রহণ করতে পারতেন ইরাবতী। সে চেষ্টা যে হয়নি এমনও নয়। অলৌকিক রূপগুণের অধিকারিণী তিনি, তাঁকে সাদরে বরণ করবার জন্য সুপাত্রের অভাব ছিল না নাগ সমাজে। বিশেষতঃ তাঁর দেবরগণই প্রস্তুত ছিলেন সেজন্য। কিন্তু ইরাবতী আগ্রহ বোধ করেন নি। বিচিত্র এক বিষণ্ণতায় নিঃসঙ্গ বাস করতেন তিনি বিচ্ছিন্ন একাকিনী।

তারপর—কি ঘটেছে চিত্রাঙ্গদা জানেন না। দীর্ঘকাল তিনিও সখীসঙ্গ বঞ্চিতা। কখন কেমন করে কোন অবসরে অর্জুনকে দর্শন করেছেন ইরাবতী, নিঃসঙ্গ চিত্ত তাঁর কখনই বা উদ্বেল হয়েছে

প্রণযাবেগে, কেমন করে সন্ধান করেছেন বনচর পাণ্ডবের—কিছুই তাঁর জানা নেই। ঘটনার পরিণামটুকুই শুধু ইরাবতীর বার্তায় বিধৃত। বিশ্বের প্রণযিনী নারী কুলে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন তিনি। আসক্ত পুরুষ আকাঙ্খিতা নারীকে হরণ করে—এই তো এতকাল জেনেছে মানুষ। তিনিই প্রথম দেখালেন প্রযোজনে অনুরূপ আচরণে রমণীও সমর্থা।

আবার হাসলেন তিনি। অপ্রস্তুত, সিক্ত দেহ, পাশবদ্ধ অর্জুনের হতচকিত মূর্ত্তিটি কল্পনা করবার চেষ্টা করলেন, উপভোগও করলেন মনে মনে। হায় পার্থ—চরাচর খ্যাত ধনুর্দ্ধব!

কিন্তু ইরাবতীব বার্ত্তায সন্তুষ্ট হতে পাবেন নি তিনি। আপন শ্রেয়ো লাভেব আনন্দে সখী এমনই বিহ্বল যে নিজের কথা যত জানিযেছেন, অর্জুনের মনোভাব ততটাই অস্পষ্ট তাঁর বার্ত্তায।

অথচ সে কথা চিন্তা করতে হয চিত্রাঙ্গদাকে। পিতা বৃদ্ধ হযেছেন। তিনি তাঁর একমাত্র সন্তান। পিতার অবর্ত্তমানে এই রাজ্যের উত্তরাধিকাবিণীও তিনিই। ইতিমধ্যেই রাজ্য চালনাব অধিকাংশ দাযভাব তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন বিচিত্রবাহন। স্বযং যাপন করছেন নিভৃত অবসর জীবন।

অতএব মনিপুরের শুভাশুভ, মঙ্গলামঙ্গলের তত্ত্বাবধান এখন তাঁকেই করতে হয। তাঁকেই নির্দেশ দিতে হয় মন্ত্রীদের। চালনা করতে হয সেনাপতিকে। দৃষ্টি রাখতে হয় কৃষি, বাণিজ্য ও আয়-ব্যয়ের প্রতি। সম্প্রতি সে দাযীত্ব আরও গুরুভার হযেছে। কারণ সমতল ভারতের রাজ্যগুলি শক্তিশালী হয়ে উঠছে ক্রমাগত। কুরু, কোশল ও কাশীরাজের শক্তি সমীহ করবার মত। চেদিরাজ শিশুপাল মদমত্ত। সিন্ধুপতির মতিগতিও স্বস্তিকর নয়। মৎস্য দেশ আযতনে বিরাট। সম্পদশালীও বটে। তবে রণ-স্পৃহা সীমিত। অন্ততঃ দিগ্বিজয বাসনা এখনও দেখা যায়নি। প্রাগজ্যোতিষ অধিপতি ভগদত্ত মহারথ। তাঁর শিক্ষিত এবং সুশৃঙ্খল রণহস্তী বাহিনী যে

কোনও রাজন্যের ঈর্ষা উৎপাদন করতে পারে, কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁকে নিয়ে চিন্তিত হবার কিছু নেই। কারণ অধিকাংশ পার্বত্য জাতির মত তিনিও শান্তিপ্রিয়। আপন শক্তি রাজ্যসীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতেই তিনি ভালবাসেন।

পাঞ্চালের শক্তি এখন খণ্ডিত হয়েছে। স-শিষ্য দ্রোণাচার্য্যের আক্রমণে পর্য্যুদস্ত ও বন্দী হযেছিলেন তিনি। পরে দ্রোণেরই কৃপায় মুক্ত হয়েছেন, অর্দ্ধ রাজ্যও লাভ করেছেন। গঙ্গার উপকূলে সমৃদ্ধ মাকন্দী নগরী ও কাম্পিল্যপুরী তাঁর শাসনে আছে বর্তমানে। অপরার্দ্ধে চর্মন্বতী নদী পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ড দ্রোণের অধিকার ভুক্ত। কিন্তু সেজন্য নিশ্চিন্ত হবার কিছু নেই। স-পুত্র যজ্ঞসেন দুর্জয়। সাম্প্রতিক পাণ্ডব কুটুম্বিতায় শক্তি বৃদ্ধি হযেছে তাঁর। বিশেষতঃ রাজ্য খণ্ডিত ও রাজকোষ দুর্বল হয়েছে বলেই পররাজ্য গ্রাসে উদ্যোগী হওয়া অসম্ভব নয় তাঁর পক্ষে।

এদিকে মগধরাজ জরাসন্ধ চক্রবর্ত্তী সম্রাট পদবী অর্জন করেছেন। দীর্ঘ দিগ্বিজযে বহু রাজ্য তথা রাজ পরিবারের সর্বনাশ সাধনের পর প্রশমিত হয়েছে তাঁর রণস্পৃহা। এবং—

এবং সাম্প্রতিক অভ্যুদয় ঘটেছে ইন্দ্রপ্রস্থে এই পাণ্ডব ও দক্ষিণ পশ্চিম সমুদ্র তীরে দ্বারকায় যদু বংশীয়দের। তিনি জেনেছেন কৃষ্ণ বলরাম অমিত শক্তিধর। বৃদ্ধ পিতা বসুদেবকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্যের শাসন রশ্মি ধারণ করে আছেন এই দুই ভ্রাতা।

পিতা ইদানীং চিন্তিত থাকেন। আর্যাবর্ত্তের শক্তিশালী কোনও রাজবংশের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের ইচ্ছাও প্রকাশ করেন মাঝে মাঝে। তিনি বুঝতে পারেন রাজ্যের নিরাপত্তার প্রয়োজনেই এই তাঁর ইচ্ছা। বস্তুতঃ ভারতখণ্ডের আগ্রাসী ক্ষাত্রশক্তিকে প্রতিহত করে হিমাদ্রির স্নেহচ্ছায়ায় কিছু কিছু পার্বত্য জাতি আজও রক্ষা করে চলেছে তাদের স্বাধীন অস্তিত্ব। কোনও আর্য্য রাজশক্তির বশ্যতা তারা স্বীকার করবে না। বিশেষত গন্ধর্ব এবং নাগেরা কিছুতেই শৃঙ্খল

পরবে না কণ্ঠে। একদা আত্মদ্বন্দ্বে খণ্ড ছিন্ন নাগজাতি তাদের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার জন্যই বিতাড়িত হয়েছে তাদের প্রাচীন বাসভূমি অহিচ্ছত্রা থেকে। কিন্তু ইদানীং তারাও সংঘবদ্ধ।

এইসব কারণেই সর্বদা চিন্তিত থাকতে হয় তাঁকে। সম্ভাব্য সকল রকম সঙ্কট থেকে নিজের এই ক্ষুদ্র রাজ্য রক্ষা করতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সেজন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থাও অবলম্বন করেছেন তিনি। রাজ্য-সীমা সুরক্ষিত করেছেন। নির্মাণ করেছেন দুর্গ, প্রাকার ও পরিখা। শস্ত্র সংগ্রহ ও সেনাবল বৃদ্ধিতে কোনও কার্পণ্য করেন নি। অপরাপর রাজন্যদের শক্তি, কোষ ও বলের সংবাদ রাখতে নিযুক্ত আছে অনেক বেতন ভোগী গূঢ়পুরুষ। তারা সুযোগ্য এবং স্বকর্মে অভিজ্ঞও বটে।

গন্ধর্বেরা দুর্বল নয়। তারা বীর এবং বিক্রমশালী। যুদ্ধ বিজ্ঞানেও তারা যথেষ্ট উন্নত। সাধারণ ব্যবহার্য্য প্রাকৃত অস্ত্র শস্ত্র ছাড়াও সাধনা অর্জিত কিছু দিব্যাস্ত্র তাঁর আছে। অক্লান্ত চেষ্টায় সামরিক শক্তির বিকাশ ঘটিয়েছেন তিনি। নর-নারী নির্বিচারে মণিপুরবাসী এখন অস্ত্র-ধারণে সমর্থ। হ্যাঁ—নারীরাও। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যুদ্ধ যখন হয়ে ওঠে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়—তখন আত্ম-প্রয়োজনেই নারীদেরও অস্ত্রধারণ করা কর্ত্তব্য। এবং এখন তাঁর ভরসা আছে তেমন কোনও সঙ্কট যদি সত্যই কোনও দিন উপস্থিত হয়, তাঁর একটি মাত্র আহ্বানে পলক-পাত-মাত্রে সমগ্র জাতি পরিণত হবে এক শিক্ষিত সুশৃঙ্খল সেনাদলে। তথাপি—

তথাপি এই মুহূর্ত্তে কোনও যুদ্ধ তিনি চান না চান না অপর কোনও রাজশক্তির সঙ্গে সংঘাত।

অথবা শুধু এখনই নয়, সর্বকালে সকল সময়ের জন্যই যুদ্ধকে ঘৃণা করেন তিনি। তিনি জানেন যুদ্ধ ভয়ানক। যুদ্ধ নিয়ে আসে হত্যা, মৃত্যু, হাহাকার। প্রজা শোষিত হয়, রাজকোষ হয়ে যায় শূন্য। দেশ নির্জিত হয় দুর্ভিক্ষ, মারী এবং দারিদ্রে। অপরের সম্পদ শোষণ করে বিজেতা পুষ্ট হন, বিজিত বিনষ্ট হন নিঃশেষে।

তিনি কিছুতেই বুঝতে পারেন না—অপত্য নির্বিশেষে প্রজাপালন করবার শপথ নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন যে রাজা—ষষ্ঠাংশ কর গ্রহণ করেও কেমন করে অপত্যসমান প্রজার মাথায় যুদ্ধের মত অভিসম্পাত আরোপ করতে পারেন তিনি !

—ঘৃণা করেন তিনি—ঘৃণা করেন রাজ চক্রবর্ত্তী পদবী লোভী সেইসব শক্তিমত্ত, হীন স্বার্থান্ধ ক্ষত্রিয়দের—যুদ্ধ যাঁদের বিনোদন, হত্যা যাঁদের বিলাস। তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণ উপলক্ষ্য করে লোকক্ষয়কর ব্যসন উপস্থিত করেন তাঁরা। প্রজা সর্বস্বান্ত হয়, দেশ হয় ছিন্নভিন্ন. জাতির পঞ্জরে পঞ্জরে পরিব্যাপ্ত হয় যে অভিশাপ—প্রজন্মের পর প্রজন্ম অতীত হয়েও তার প্রতিকার সম্ভব হয় না। আপন অন্তরের লোভ, হিংসা ও স্বার্থপরতাকে আবৃত করবার জন্যই যুদ্ধকে ধর্ম আখ্যা দিয়েছেন তাঁরা। চিত্রাঙ্গদা জানেন, বিশ্বাস করেন—যুদ্ধে কোনও ধর্ম নেই। সব যুদ্ধই অধর্ম, অমঙ্গল. মহাপাপ ; যুদ্ধ মানব জীবনের এক নিদারুণ অভিশাপ।

উঠলেন তিনি। শুভ্র অজীন-আস্তৃত আসনপীঠ পড়ে রইল অবহেলায়। অন্তরের অস্থিরতায় চঞ্চল, বাতায়নে এসে দাঁড়ালেন। অরণ্য-পর্বত-সঞ্চারী শীতল বায়ু প্রবাহ অভিষিক্ত করল তাঁর স্বেদসিক্ত ললাট। স্পর্শ করে গেল কুন্তলাগ্রে ও বাহুমূলে। চক্ষু মুদিত করলেন তিনি।

অনেকক্ষণ—। ধীরে ধীরে শান্ত হল হৃদয়। বিক্ষুব্ধ চিন্তারাশি অস্থির চৈতন্যকে মুক্তি দিয়ে অন্তর্হিত হল সাময়িকভাবে। বাহিরে দৃষ্টিপাত করলেন তিনি। মুহূর্ত্তে মুগ্ধ হল চক্ষু। রাত্রি অনেক। পিনাকপাণির শিরোভূষণ খণ্ডচন্দ্র উদিত হয়েছে আকাশে। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় সুদূর, মধুর, রহস্যময় হয়ে উঠেছে অরণ্য। অদূরে নির্ঝর ধারা। এক চন্দ্র শত চন্দ্র হয়ে নৃত্য করছে সেখানে।

দূরের কোনও সঙ্গীতভবন থেকে ভেসে আসছে গম্ভীর মন্দ্রিত সঙ্গীত ধ্বনি। গন্ধর্বেরা জন্ম সূত্রে নট। নৃত্য গীতে তাদের চিরকালীন

অধিকার। যাঁর শাশ্বত নৃত্যচ্ছন্দে, বাম-দক্ষিণ চরণের ঘাতে প্রতিঘাতে, তালে তালে স্পন্দিত হয় জন্ম, মৃত্যু, সৃজন, সংহার—কালাকালের অধিশ্বর সেই নটরাজ শঙ্কর তাদের উপাস্য দেবতা। দেবলোকের সঙ্গীত সভায় শ্রেষ্ঠত্বের আসনখানি গন্ধর্বের জন্যই সংরক্ষিত।

বাসন্তী সমীরণ শিহরিত প্রকৃতি আর মন্দ্রিত সঙ্গীত-স্বর পলকেই অন্যমনস্ক করল তাঁকে। তরুণ হৃদয় দুশ্চিন্তাকে প্রশ্রয় দেয় না। যৌবন গুরুত্ব দেয় না শঙ্কা কিংবা আতঙ্ককে। দূর-বিস্তৃত পর্বত সানুর পানে চেয়ে চেয়ে অকস্মাৎ আতপ্ত হল তাঁর গণ্ড। সুগৌর মুখে রক্তাভাস দেখা দিল। অকারণ লজ্জাভারে আঁখি আনত করে তিনি ভাবলেন—ছিঃ! সখী ইরাবতী কি নির্লজ্জা! হতে পারেন পাণ্ডুপুত্র রূপবান, গুণবান অথবা বীর্য্যবান—চিত্রাঙ্গদা কিছুতেই চিন্তা করতে পারেন না—কোনও নারী কেমন করে কোনও পুরুষকে বলতে পারে—আমি তোমারই জন্য সমর্পিতা—গ্রহণ কর আমাকে।

লজ্জা রুদ্ধ কম্প্রস্বরে—প্রায় অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন তিনি—হা ধিক্ সখী!

॥ ৩ ॥

মুগ্ধ চক্ষে নগর নিরীক্ষণ করছিলেন অর্জুন। তিনি বিস্মিত। কল্পনাও করতে পারেননি যে ভারতের প্রত্যন্তভাগে অরণ্য-পর্বতময় এই ভূখণ্ডে এমন এক বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে তাঁর জন্য। পরিচ্ছন্ন ঋজু রাজপথ, আড়ম্বর বর্জিত কিন্তু সুরম্য সারি সারি বাসগৃহ, সুদৃঢ় দুর্গ এবং সু-সংস্থাপিত সেতুশ্রেণী। সব পথ চতুষ্পথে ব্যবস্থিত, ছায়াচ্ছন্ন এবং সুগম। জলাশয় অনেক। প্রাকৃতিক নয়, রাজকীয় ব্যবস্থাপনায় খনন করা কৃত্রিম বাপী সরোবর। নাগরিকদের স্নান ও পানের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে চিহ্নিত।

এখন প্রত্যূষকাল। সূর্য্য মাত্রই উদয় হয়েছে। রাজপথে জন সমাগম এখনও অপ্রচুর। স্নানার্থী, পুণ্যার্থী ও সেবকদের দেখা যায়। কিছু কিছু রাজপুরুষও আছেন। অধিকাংশই পদচারী। ক্ষুদ্রকায় পার্বত্য অশ্বে আরোহণ করেও চলেছেন কেউ কেউ। কোথায় চলেছেন এঁরা? এত প্রভাতে এত ব্যস্ততাই বা কিসের?

পথপার্শ্বে পশুপতি শিবের মন্দিরে আরম্ভ হয়েছে উপাসনা। স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত বন্দনা গানে মন্দ্রিত হচ্ছে আকাশ। লক্ষ্য করলেন, অধিকাংশ পদচারীর গতি সেদিকেই। রাত্রি অবসান। দিনের কর্ম আরম্ভ করবার পূর্বে ইষ্ট দেবতার আরাধনায় যোগ দিতে চলেছেন তাঁরা। সকলে একত্র হয়ে সম্মিলিত উপাসনা এঁদের প্রিয়। গন্ধর্বেরা সঙ্গীতনিপুণ জাতি। জপ, ধ্যান, মন্ত্র, যজ্ঞ কিংবা অগ্নিহোত্র অপেক্ষা তাল, লয়, স্বর সমন্বিত নৃত্য গীতে আরাধ্য দেবতার পূজা করতে এঁরা ভালবাসেন। হিমাদ্রির অধিকারবাসী অপরাপর আরও অনেক জাতির মত এঁরাও শিবের উপাসক।

মন্দির অভিমুখী ভক্তজনের সঙ্গ ধরলেন অর্জুনও। তাঁরও দিনের

কর্ম আরম্ভ হতে চলেছে। তার পূর্বে ত্রিপুর-বিনাশন, মহাভয়-নাশন ত্রিশূলী, ত্রিলোকী, প্রলয়ঙ্কর সেই শংকরের বন্দনা করে আসা যাক।

অতুলনীয় এদের বাণিজ্য সংযোগ। মণিপুরের পণ্য বিপণীগুলির ঐশ্বর্য্য দেখে তিনি হতবাক। ভারতখণ্ডের প্রায় সব দেশের বণিক উপস্থিত এখানে। এসেছেন শক, কিরাত এবং কিম্পুরুষ দেশীয় ব্যবসায়ীরাও। সুদূর নাগরাজ্যের বৈদ্যরা এসেছেন তাঁদের বিদ্যা ও অভিজ্ঞতার পসরা বহন করে। এঁরা বণিক নন, চিকিৎসক। অস্ত্রক্ষত এবং বিষ-বিজ্ঞানে এঁদের দক্ষতা সুবিদিত। বিস্মিত হলেন অর্জুন। সাধনালব্ধ বিদ্যা গোপন করে রাখাই নিয়ম। এঁরা সে বিদ্যা এমনভাবে প্রকাশ্যে বিক্রয় করছেন! ভালভাবে লক্ষ্য করে বুঝলেন—বিদ্যা নয়, ভেষজ ওষধি সমূহই তাঁদের পণ্য।

যে কোনও হট্টস্থলী বা জনবহুল স্থানের নিয়মমত এখানেও এসে উপস্থিত হয়েছে দূর দেশাগত অনেক ভাট, নট, গায়ক এবং কথক। তাদের বেষ্টন করে উৎসুক জনতার সমাবেশ। গীত এবং কথিত হচ্ছে নানা কথা, কাহিনী ও উপাখ্যান। আর এই অসংখ্য মানুষের সমবেত আলাপচারণ, আদেশ নির্দেশ, উত্তর প্রত্যুত্তর, উচ্চকণ্ঠে সম্ভাষণের সঙ্গে গীত বাদ্যধ্বনি ইত্যাদি মিলিত হয়ে সৃষ্ট হচ্ছে একটি প্রবল দুর্বোধ্য কোলাহল। জন সমাগমে পথ চলা দুষ্কর। যান-বাহন-বাহক, অশ্ব-অশ্বতর, পণ্যবাহী শকট প্রভৃতিকে এক দিকে ব্যবস্থিত করেও স্থান সঙ্কুলান সম্ভব হয়নি। কয়েকজন রাজপুরুষকে অতি ব্যস্ত হয়ে এই অব্যবস্থার তত্ত্ব করতে দেখলেন তিনি। বাহন ও বাহক পশুদের মূত্র-পুরীষ প্লাবনে স্থানটি প্রায় কর্দম হ্রদে পরিণত হয়েছে, দুর্গন্ধে নরকতুল্য। নাসিকা আবৃত করে অতি দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করলেন তিনি।

মাঙ্গলিক চিহ্ন ভূষিত বিপণি-শ্রেণীর সজ্জা মনোরম। ক্রেতা আকর্ষণের চেষ্টায় কোনও ত্রুটি রাখেননি অভিজ্ঞ বণিককুল। কি নেই

এখানে। সিংহলের মুক্তা, মালবের মরকত, কিন্নর দেশীয় পশু লোম, প্রাগজ্যোতিষপুরের ক্ষৌমবস্ত্র, এবং পৌণ্ড্র দেশাগত রত্নালঙ্কার। দাক্ষিণাত্য উপজাত পট্টবাস এবং বঙ্গদেশের অতি সূক্ষ্ম নানা বর্ণ কার্পাস বস্ত্র দেখে বিস্মিত হলেন তিনি। এত দূর দেশান্তরের বণিকরা আসেন এখানে! দুর্গম অরণ্য পর্বত লঙ্ঘন করে, গিরি শিরা কিংবা নদীখাত পথে কেন আসেন এই দরিদ্র দেশে? এইসব মহার্ঘ সামগ্রীর ক্রেতা আছে কি এখানে? ধনাঢ্য জাতি বলে তো মনে হয় না এদের। আড়ম্বরযুক্ত পরিচ্ছদ, কিংবা রত্নালঙ্কার ধারণ করতেও বড় দেখছেন না। তাহলে এতদূরে এসেছেন এই বণিকদল কিসের প্রত্যাশায়?

সংশয় নিরসনে তৎক্ষণাৎ এক বৃদ্ধ ব্যবসায়ীকে সম্ভাষণ করলেন তিনি। শিষ্টালাপে তাঁকে প্রসন্ন করে প্রশ্ন করলেন—বণিক শ্রেষ্ঠ; আপনাকে দেখে তো দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী বলে বোধ হয। কোথায দক্ষিণাবর্ত্ত, আর কোথায় ভারতখণ্ডের সুদূর উত্তর পূর্ব প্রান্তে এই মণিপুর। এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে কেন এসেছেন আপনারা? এইসব মহামূল্য পণ্যরাজি—এর ক্রেতা কি আছে মণিপুরে?

—"অবশ্যই আছে" বণিক বললেন। —বিক্রয়ের সম্ভাবনা না থাকলে বণিক জাতি কখনই পণ্য বহনের ক্লেশ স্বীকার করে না। ভদ্র আপনি লক্ষ্য করে দেখুন—সাধারণ পণ্যার্থীরা এই মণ্ডলীর প্রধান ক্রেতা নয। আমরা নানা দেশের বণিকরাই পরস্পরের পণ্য বিনিময় করে থাকি এখানে। ওই যে দেখছেন খর্বনাসা, বিকৃত বদন, বিরূপাক্ষ ব্রহ্মদেশীয় বণিকদল—ওঁরা এনেছেন গজদন্ত এবং প্রশিক্ষিত রণহস্তী। মহাকায, মেঘবর্ণ সেই হস্তীযূথ মণিপুরের রাজকীয প্রহরায় সুরক্ষিত আছে। কোনও না কোনও অন্য দেশীয় বণিক তাঁর পণ্যের সঙ্গে বিনিময় করবেন এই হস্তীদের। যদি নাও করেন—যদি এ যাত্রায় বিক্রয় নাও হয়—চিন্তার কিছু নেই। মণিপুরের রাজ অধিকারে তাদের পালনভার অর্পণ করে ফিরে যাবেন বণিকরা। পরবর্ত্তীকালে পুনরায় এসে চেষ্টা করবেন বিক্রয়ের।

—মণিপুর রাজ সেই পণ্ডদের রক্ষণাবেক্ষণের দায় বহন করবেন ? তাঁর লভ্য ?

—তাঁর লভ্য রাজকর। নাগরিকরা লাভবান হচ্ছে খাদ্য পানীয় তথা তাদের নিজস্ব কৃষি ও শিল্পজাত সামগ্রী বিক্রয়ের সুযোগ প্রাপ্ত হয়ে। এ অতি উত্তম ব্যবস্থা ভদ্র।

ব্যবস্থা উত্তম। স্বীকার করলেন তিনি। কিন্তু পথ দুস্তর। পথে দস্যুভয় আছে, নরমাংসভোজী রাক্ষসদের উপদ্রবও অসম্ভব নয়।

বণিক হাসলেন—উপদ্রব কোথায় নেই বিদেশী ? আমরা বণিকরা উপজীবিকার প্রয়োজনে সর্বপ্রকার উপদ্রব সহ্য করতে অভ্যস্ত। বরং অরণ্যচারী এই অনার্য্যদের মধ্যে দস্যুতার প্রবণতা অপেক্ষাকৃত অল্প। এরা বিশ্বস্ত, সত্যবাদী এবং প্রধানতঃ সরল হয়। নিতান্ত এদের অধিকার কিংবা সমাজ ব্যবস্থায় অনধিকার হস্তক্ষেপ না করলে হিংস্রও হয় না। তুলনায় মূল ভারতখণ্ডই এখন বণিক জাতির পক্ষে বিশেষ ভয়প্রদ। আপনি সমতলের অধিবাসী। আপনার অজানা থাকবার কথা নয়—আর্য্যাবর্তীয় রাজারা প্রায়শঃই সংঘর্ষে লিপ্ত থাকেন। পরস্পরে সর্বদা বিবদমান। রাজকোষ শূন্য, আর সেই শূন্যতা পূর্ণ করতে বহিরাগত বণিকদের উপর অত্যধিক কর আরোপ করা হয়ে থাকে। শাসন শিথিল। অসাধু, উৎকোচলোভী রাজপুরুষরা রাজার নয়—বস্তুতঃ আপন স্বার্থ-সাধনে তৎপর। সমগ্র ভারতখণ্ড ব্যাপ্ত করে দেখা দিয়েছে মাৎস্যন্যায়, দস্যু তস্কররাও তাই সেখানে অকুতোভয়। নরমাংস কিংবা আমমাংসভোজী রাক্ষসদের প্রতিরোধ করতে সশস্ত্র রক্ষক পালন করি আমরা। কিন্তু এই রাজভয়ের প্রতিকার কি ? ভদ্র ! শান্তি এবং নিরাপত্তাই বাণিজ্যের ভিত্তিভূমি। এখানে সেই শান্তি আছে, সুরক্ষাও বর্তমান। সুতরাং কষ্টকর হলেও, এই দীর্ঘ পথ যাত্রা কাঙ্খিত আমাদের কাছে।

অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করলেন অর্জুন। প্রবীণ বণিক বহুদর্শী। ভারত-ভূমির প্রকৃত অবস্থা তিনি উপলব্ধি করেছেন। বস্তুতঃ সে সমস্যার

স্বরূপ অর্জুন নিজেও জানেন। কিন্তু উপায় নেই। অন্ততঃ এখন—এই মুহূর্তে কোনও উপায় নেই। একটিই মাত্র সমাধান সম্ভব এই সমস্যার। এক এবং অখণ্ড একটি সাম্রাজ্যের ছত্রছায়াতলে একত্রিত করতে হবে খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত এই বিশাল ভূমিকে। কোনদিন যদি তা সম্ভব হয়, তবেই দূর হবে এই মাৎস্যন্যায়। কিন্তু সেদিন এখনও বহু দূর। কবে তা সম্ভব হবে অথবা আদৌ হবে কিনা কোনদিন—তা জানা নেই তাঁর। অতএব শান্তিপ্রিয়, নিরাপত্তাভিলাষী বণিকদলকে আর্যাবর্ত্তের রাজ্যগুলি পরিত্যাগ করে সুদূর এই পার্বত্য প্রদেশে অভিযান করতে হবে আরও অনেকদিন।

মণিপুরের নিজস্ব পণ্য অসংখ্য বা মহার্ঘ না হলেও নিতান্ত তুচ্ছ করবার মত নয়। পার্বত্য ফল, কন্দ, মধু, মধুচ্ছিষ্ট, নানা বর্ণ প্রস্তর পাত্র সহ শষ্য এবং পর্য্যাপ্ত চন্দন সার।

অভিজ্ঞতা সূত্রে তিনি জানেন ব্যবসাযের ক্ষেত্রে বণিকরা কখনও কখনও ধর্ম লঙ্ঘন করবার চেষ্টা করে থাকে। এমন কি কাশী, পাঞ্চাল কিংবা হস্তিনার মতো সুশাসিত রাজ্যেও বনবাসী বর্বর তথা জাগতিক কুটিলতায় অনভিজ্ঞ কিরাতদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করবার অভিযোগ পাওয়া যায়। এখানেও যে তার ব্যতিক্রম হবে এমন আশা অবাস্তব। অতএব পদস্থ রাজপুরুষরা নিয়োজিত আছেন প্রতিকারে। বনচর মানুষেরা তাদের তাবৎ সামগ্রী বহন করে এনে তাঁদের হাতে সমর্পণ করছে। তাঁরাই নির্দ্ধারণ করছেন পণ্যের উৎকৃষ্ট অপকৃষ্টতা, স্থির করে দিচ্ছেন মূল্য, উপযুক্ত ক্রেতার সন্ধান করে বিনিময়েও মধ্যস্থতা করছেন।

সুগন্ধি মৃগমদের মূল্য সম্বন্ধে এক বণিক উষ্মা প্রকাশ করছিলেন। এক রাজপুরুষ স্মিত হেসে বললেন—বণিকবর! এই মৃগনাভি সদ্য আহরিত, উৎকৃষ্ট ও তীব্র সুগন্ধিময়। এর মূল্য তো কিছু অধিক হতেই পারে।

বণিক বললেন—কিন্তু এত অধিক? জম্বুদ্বীপের কোন দেশে

মৃগনাভি এত অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়? এই সুগন্ধি কি আমি কোথাও বিক্রয় করতে পারবো?

পারবেন ভদ্র। একমাত্র হিমালয়বাসী মৃগগণেই এত উৎকৃষ্ট মৃগনাভি সম্ভব। আপনি জানেন মণিপুর রাজের অধিকারে সুরক্ষিত কিছু বনাঞ্চল আছে। অনেক কস্তুরী মৃগ সেখানে বিচরণ করে। রাজার বিশেষ অনুশাসন বলে বনবাসী বর্বরেরাই কেবল সেই মৃগ বধ ও সুগন্ধি আহরণের অধিকারী। অন্য কোনও মণিপুরবাসীর সে অধিকার নেই।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বণিক বললেন,—কেন নেই সে কথা আমি বুঝতে পারি না সুরসেন। মহার্ঘ্য এই সামগ্রীতে কেবলমাত্র বর্বরদেরই অধিকার স্বীকৃত কেন? এদের প্রয়োজন সামান্য। দিনান্তে কিছু খাদ্য এবং লজ্জা নিবারণের উপযোগী কটিবস্ত্র মাত্র এদের আকাঙ্খা। অতএব মৃগনাভি আহরণের মতো শ্রমসাধ্য কর্ম এরা কদাচিতই করে থাকে। সংগ্রহ অধিক হলেই পণ্য সামগ্রীর মূল্য হ্রাস পায়। মণিপুর রাজ্যের বিধানে আহরণ এত নিয়ন্ত্রিত বলেই এর মূল্য এত অধিক। আমার মতে মৃগমদ সংগ্রহের জন্য বহু রাজসৈনিক নিয়োগ করা কর্ত্তব্য আপনাদের।

—কিন্তু এদের তাহলে কি উপায় হবে বণিক? এরা কৃষিকার্য্য জানে না, বাণিজ্য কিংবা অন্য শিল্প কর্মে অনভিজ্ঞ, চিরকাল বনচারী ও যাযাবর এই প্রজাদের জীবিকা নির্বাহেরও তো কোনও সংস্থান চাই।

—অশক্ত উপায়হীন প্রজাদের রাজাই পালন করে থাকেন।

—কিন্তু এরা তো ভিক্ষুক নয়। রাজদত্ত দান গ্রহণ অপেক্ষা আপন শ্রমলব্ধ অন্নের উপর নির্ভর করাতেই এরা মর্য্যাদা জ্ঞান করে। এদের সেই আত্মমর্য্যাদাবোধের উপর আঘাত করা অনুচিত। সেই কারণেই কস্তুরী মৃগের উপর অধিকার সাব্যস্ত হয়েছে বর্বরদের। সর্বদা অস্থির, ধাবমান, প্রমত্ত মৃগগণকে বহুকষ্টে আবদ্ধ তথা সুগন্ধি সংগ্রহ করতে হয়। কষ্টলব্ধ এই সামগ্রী ন্যায্য মূল্যেই ক্রয় করা আপনার কর্ত্তব্য।

বন্ধু ; আমি জানি উত্তর অথবা দক্ষিণের কোনও সমৃদ্ধ রাজ্যে দেবভোগ্য এই সুরভি রত্নরাজির বিনিময়েই আপনি বিক্রয় করতে পারবেন।

সুতর্ক এবং শিষ্ট বাক্যে পরাস্ত হলেন বণিক। প্রসন্ন মুখে বললেন—ন্যায্যমূল্যেই ক্রয় করবো সুরসেন। আপনি প্রসন্ন হন। মণিপুরপতির মঙ্গল হোক। আপনার শুভেচ্ছা আমার স্মরণ থাকবে। ভগবান ভবানীপতির প্রসাদে আমি যেন রত্নমূল্যেই এই সৌগন্ধিক বিক্রয় করতে পারি। ভদ্র সুরসেন! আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন। আমরা—এই নানা দেশাগত বণিক সমাজ জানি, বিশ্বাস করি—অন্ততঃ গন্ধর্ব দেশ এই মণিপুরের পণ্যমণ্ডলীতে প্রবঞ্চনার কোনও স্থান নেই। আপনার মত সাধু রাজপুরুষগণের কল্যাণে মণিপুরের বাণিজ্য লক্ষ্মী চির অচঞ্চলা।

ঘটনাটি সামান্য হলেও এর মধ্যে কোথায় যেন একটি মহত্তর যথার্থতা উপলব্ধি করলেন অর্জুন। অনুভব করলেন সর্বস্তরে প্রসারিত, সর্বতো-সমদৃষ্টি এক দক্ষ প্রশাসনের অস্তিত্ব। সত্যই তো, সকলেই কিছু আর সর্ব কর্মে পারদর্শিতা অর্জন করতে পারে না। অদক্ষ অনিপুণ মানুষও প্রজাকুলে সম্ভব। তাদেরও রক্ষা করতে হয় এবং সে কর্তব্য রাজারই।

মণিপুরের পশু সম্পদ তেমন উন্নত নয়। পাঞ্চাল কিংবা মৎস্য-দেশের মত পর্য্যাপ্ত দুগ্ধশালিনী গাভী অথবা উন্নতকায় বৃষ তিনি একটিও দেখেন নি। এদের গাভীগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি, নিশ্চিতভাবে স্বল্প-দুগ্ধাও। কিন্তু সে ক্ষতি পরিপূরিত হয়েছে অসংখ্য পার্বত্য ছাগ ও মেষপালে। মণিপুর সন্নিহিত ঢালু উত্তরণ-ভূমিতে যতদূর দৃষ্টি যায় তরঙ্গিত মেঘমালা সদৃশ সে পশুপাল তিনি দেখেছেন। চারণ-ভূমির সযত্ন রক্ষণাবেক্ষণও মুগ্ধ করেছে তাঁকে। বৃষ্টি নিরপেক্ষ তৃণোদ্গমের এমন ব্যবস্থা ইতিপূর্বে আর কোথাও দেখেছেন বলে তাঁর মনে পড়ে না। দূরের নির্ঝরিণীর প্রবাহপথ খনন করে জল আনা হয়েছে। ফলতঃ ভূমি থাকে সর্বদা সরস এবং প্রভূত তৃণশালিনী। পরিশ্রমী

পার্বত্য অশ্বে আরোহিত গুটিকয় বালক মাত্র-রক্ষিত বিশাল এই পশুপালের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়েছিল তাঁর। আরণ্যক রাজ্যে চৌর্য্যবৃত্তি না থাক জন্তু ভয় আছে। হিমাদ্রির উত্তরণে অনেক আমিষাশী জন্তু বাস করে। বাঘ, চিতাবাঘ, বিশালাকৃতি কৃষ্ণ ভল্লুক, ধূর্ত্ত ও হিংস্র বৃকগণ গৃহপালিত পশুহরণে সচেষ্ট থাকে সর্বদা। গিরি-বিহারী সিংহও নেমে আসে ক্ষুধার্ত্ত হয়ে। ক্ষিপ্র, বিদ্যুৎগতি, মহাকায়, মহাবল সেইসব শ্বাপদের আক্রমণ থেকে এদের রক্ষার উপায় কি ?

অনুসন্ধানে একদল শিক্ষিত কুক্কুর আবিষ্কার করে চমৎকৃত হয়েছিলেন তিনি। কৃশ ও কুদর্শন এই সারমেয়গুলিও গৃহেই পালিত এবং শিশুকাল থেকে বিশেষভাবে এই কর্মের জন্যই প্রশিক্ষিত। পশু-পালের রক্ষণাবেক্ষণে তারা সর্বদা সতর্ক থাকে এবং বিপদের সম্ভাবনা দেখামাত্র দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করে বিতাড়িত করে শত্রুকে। যে কাজের জন্য সশস্ত্র অনেক রক্ষকের প্রয়োজন হতে পারতো—এইভাবে বুদ্ধি এবং চাতুর্য্যের দ্বারা কয়েকটি মাত্র গৃহপালিত পশু নিয়োগ করেই তা করতে পেরেছে এরা। মনে মনে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন এই ব্যবস্থার এবং এক সহচরের সাক্ষাতে সে মনোভাব প্রকাশও করেছিলেন।

প্রতিক্রিয়া বিপরীত। নাসিকা কুঞ্চিত করে সে বলেছিল, অরণ্যচারী এই অনার্য্যদের কোনও ব্যবস্থাই আমাদের তুল্য হতে পারে না। ধর্মের বিধানে কুক্কুর অতি অপবিত্র পশু। তাদের স্পর্শদোষ ঘটলে ধার্মিক ব্যক্তি স্নান করে শুদ্ধ হন। এরা সেই কুক্কুরকে গৃহে স্থান দিয়েছে। মনে হয় অধিক অর্থচিন্তায় ধর্মকে এরা অবহেলা করে।

বৈষয়িক প্রসঙ্গের মধ্যে ধর্মের এমন আকস্মিক অনুপ্রবেশে হতবাক হয়েছিলেন অর্জুন। এ কি অদ্ভুত রক্ষণশীলতা! দেশ কাল পাত্র ভেদে মানুষ তার পদ্ধতি পরিবর্তন করে, লোকাচারেরও পরিবর্তন হয়।

প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তো প্রবর্তন হয়ে থাকে নানাবিধ ব্যবস্থার।

তাঁর নিজের দেশ কুরুজাঙ্গাল, খাণ্ডবপ্রস্থ বা দ্বৈতবন সন্নিহিত ঘোষ ও আভীর পল্লীগুলির দুরবস্থার কথা তিনি জানেন। চোর এবং জন্তু ভয়ে সে সব স্থানের গোপালকরা সদা সশঙ্কিত থাকে। গোধন হরণ ও নিধনের অভিযোগ প্রায়ই উপস্থিত হয় রাজদ্বারে। বহু শস্ত্রধারী দাস ও রক্ষক নিয়োগ করেও সে অবস্থার সম্যক প্রতিকার সম্ভব হয়নি। সে ক্ষেত্রে কত সহজে ও স্বল্পব্যয়ে কার্যোদ্ধার করেছে এরা। মানুষের বুদ্ধি ও দক্ষতার প্রশংসা তো করতেই হবে।

মণ্ডলীর অপরপ্রান্তে স্থান পেয়েছেন অস্ত্র ব্যবসায়ীরা। নানা অস্ত্র-শস্ত্রের বিপুল সমাবেশ দেখে চমকিত হলেন অর্জুন। ম্লেচ্ছদেশের দীর্ঘ-তীক্ষ্ণ-নিশিতধার অসি, পিশাচ-চক্ষু উৎকীর্ণ বঙ্গদেশীয় খড়্গ, সৌরাষ্ট্রের শূল, সুতীক্ষ্ণ শায়ক-সমন্বিত মহাভার ধনু এবং ভীষণ দর্শন মাগধী গদা। বর্ম, চর্ম, কবচ, শিরস্ত্রাণ—প্রাগজ্যোতিষপুর-খ্যাত রণহস্তী এবং সিন্ধুদেশের শিক্ষিত সামরিক অশ্ব—

দেখতে দেখতে মুখ গম্ভীর হল তাঁর। ললাটে ঘনালো যে ভ্রূকুটি—তাতে বিস্ময় ভিন্ন আরও কিছু আছে।

এত অস্ত্র বিক্রয় হয় এখানে!

বিস্মিত চক্ষে লক্ষ্য করলেন বিপণীগুলির ক্রেতা সমাগম। এখানে সমাবিষ্ট, হয়েছেন যাঁরা তাঁরা বহিরাগত বণিক নন। তাঁরা মণিপুর নাগরিক, এবং সমবেত হয়েছেন নরনারী নির্বিশেষে।

হাঁ, নারীরাও। সমবেত পুরুষদের সঙ্গে সমান উৎসাহে অস্ত্র-পরীক্ষা ও ক্রয় করছেন তাঁরা। কিছু হাস্য পরিহাসও শ্রুতিগোচর হল। অসিধার পরীক্ষা করতে করতে এক নাগরিকা প্রশ্ন করলেন,—শ্রেষ্ঠী সুদর্শন, আপনার এই খড়্গ শত্রু শোণিত পানে সমর্থ হবে তো?

বণিকসুলভ চতুরতায় স্বরিত হেসে উত্তর দিলেন সুদর্শন,—দেবী

নিতান্তই মৃত্যু ভয়, নতুবা আপনার করধৃত এই খড়্গামুখে এই অধমের শির সমর্পণ করে প্রমাণ দিতাম আমার খড়্গা সমর্থ কি অসমর্থ।

বিরস মুখে এক তরুণ অভিযোগ করলেন—এই ভল্লগুলি কিন্তু তেমন উপযোগী নয়। মৃগ বধ চলে, কিন্তু বন্য বরাহ প্রায়ই ব্যর্থ করে দেয় এর আঘাত।

প্রগলভ কণ্ঠে সুদর্শন বললেন—বরাহ-বীর্য্য-বিমর্দনে ভল্লের প্রয়োজন কি শ্রুতবর্মা—আপনার বাহুই তো যথেষ্ট সেজন্য।

—তাহ'লে বাহুবল অবলম্বন করাই শ্রেয়, অনর্থক ধনক্ষয় করে আপনার অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করবার সার্থকতা কি ?

সহাস্যে উক্তি করলেন পূর্বোক্ত নাগরিকা—তাহলে যে বণিকের লক্ষ্মী চঞ্চলা হন। হায় ভদ্র সুদর্শন ! শ্রুতবর্মা না হয় পুরুষ, বাহুবলই আশ্রয় করলেন। কিন্তু আমি যে নারী, বাহু নয়, বস্তুতঃ অস্ত্রেই আমার সমর-সাফল্য নিহিত। আপনার প্রহরণ যদি বিশ্বাসহন্তা হয় আমার উপায় কি ?

—মধুরও হতে পারে দেবী। ভগবান ভূতভাবনের প্রসাদে জন্মসূত্রেই নারী জাতি সশস্ত্র। কুসুমধন্বা মকরকেতন স্বয়ং নিযুক্ত আছেন যাঁদের সেবায়, সেই অঙ্গনাগণের কটাক্ষ শরে বিদ্ধ হয় না এমন কপাটবক্ষ কোথায় ? তার উপরে অস্ত্র প্রহার শুধু শক্তির অপচয়। বীরগণকে কতবার বধ করবেন দেবী ?

অপ্রতিভ লজ্জায় মুখ ফেরালেন গান্ধর্বী। নারীজনোচিত ব্রীড়ায় কপোল হল রক্তিম। মনে মনে হাসলেন অর্জুন। সুরসিক বণিকের চতুর তথা চাটুকারী প্রত্যুত্তর বিলক্ষণ উপভোগ করেছেন তিনি।

কি আশ্চর্য এই বণিক জাতি ! পৃথিবীর সর্বপ্রান্তে অবাধ তাঁদের গতি, আর কত সহজেই না মানুষের সঙ্গে সহজ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন এঁরা। জীবিকাগত প্রয়োজনেই অবিরাম বসুমতী ভ্রমণ করেন। কষ্টকর পথযাত্রা সহিষ্ণু হতে শিক্ষা দেয় তাঁদের। বহু দেশ, বহু

মানুষের বিচিত্র সংসর্গ শেখায় সমদর্শী হতে। কুবের ও কমলার আশীর্বাদ-ধন্য হয়েও চাতুর্বর্ণ বিধি অনুযায়ী সমাজের তৃতীয় বর্গে স্থান পেয়েছেন তাঁরা। অথচ বিদ্যা, বিনয়, ধৈর্য্য আদি ব্রাহ্মণোচিত গুণরাশির সমাবেশও লক্ষ্য করা যায় তাঁদের চরিত্রে। মাঝে মাঝে অর্জুনের মনে হয়—হয়তো এমনও দিন আসতে পারে এই পৃথিবীতে যখন এই বণিকরাই স্থান পাবেন সমাজের শীর্ষস্তরে। অখণ্ড ভূমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত হবে তাঁদের আধিপত্য।

অসম্ভব কি? বিশেষতঃ লক্ষ্মী যখন তাঁদের প্রতি এত কৃপাশীলা।

কিন্তু তিনি তখনও চিন্তা করছিলেন।

মণিপুরের মত ক্ষুদ্র দেশে বহু-বিচিত্র এত অস্ত্রশস্ত্রের সমাবেশ কেন?

না—বন্য ব্যাধের অস্ত্র নয়। বর্বরের মৃগয়া-উপযোগী প্রাকৃত ধনুর্বাণও নয়।

রীতিমত পরিণত যুদ্ধাস্ত্র।

তিনি স্বয়ং যোদ্ধা। এইসব প্রহরণের জাতি প্রকৃতি তিনি জানেন। এই যে শত শত তোমর, নারাচ ও নালিক—স্বর্ণ ও রত্ন খচিত প্রাস, পরশু ও শেলপাট—এই সব আয়ুধের মাহাত্ম্য ও মারণ-শক্তি অজ্ঞাত নয় তাঁর।

বিগ্রহ-বিমুখ জাতির এত ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রে কোন প্রয়োজন?

মৃগয়া মাত্রে সীমিত যাদের অস্ত্র ব্যবহার—গণ্ড-মৃগ-চর্ম নির্মিত বর্মে তাদের কাজ কি? দশাবর্ত্ত লক্ষণ চিহ্নিত সামরিক অশ্ব প্রয়োজন হয় কেন?

তিনি আরও বিস্মিত নারীদের আচরণ লক্ষ্য করে। গন্ধর্ববালারা অস্ত্রধারণ করেন! শত্রু শোণিত পানের সঙ্কল্প ধ্বনিত হয় তাঁদের কণ্ঠে—একি বিপরীত!

কৌতূহল ক্রমে অদম্য হল। পথপার্শ্বে বৃক্ষচ্ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন এক পুরাঙ্গনা। এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করলেন অর্জুন। একটু

ইতস্ততঃ—সঙ্কোচ জয় করে অগ্রসর হলেন অবশেষে। অযাচিত পরস্ত্রী সম্ভাষণের অভ্যাস তাঁর নেই—কিন্তু এঁরা তো অন্তঃপুরচারিণী অসূর্য্যম্পশ্যা নন।

সম্বোধিতা হয়ে মুখ ফেরালেন গান্ধর্বী। পলকে মুখভাব পরিবর্ত্তিত হল। বিমুগ্ধ যুগল চক্ষুর দৃষ্টির আরতি নিজের সর্বাঙ্গে অনুভব করলেন অর্জুন। এখন আর অস্বস্তি হয় না তাঁর। নিজের দেবতা দুর্লভ দিব্যকান্তি সম্বন্ধে এখন তনি সচেতন। বিস্তীর্ণ ভারতখণ্ডের পথে ও জনপদে এমন অনেক রমণী চক্ষুর বন্দনায় অভিষিক্ত হয়েছেন তিনি। বয়স্যেরা বলে তাঁকে দর্শন করলে নিতান্ত কুল কামিনীরাও নাকি স্মর-চঞ্চলা হন। নারী চক্ষুর এই সরস অভিনন্দন অনভ্যস্ত নয় তাঁর।

নম্র স্বরে অর্জুন বললেন,—ভদ্রে আমি বিদেশী পর্যটক। আর্য্যাবর্ত্ত থেকে সদ্য সমাগত। এই দেশের রীতিনীতি কিছুই জানি না। কিছু জিজ্ঞাস্য আছে আমার। কৌতূহল যদি মার্জনা করেন, আর যদি অনুমতি করেন—কয়েকটি প্রশ্ন করতে পারি।

স্মিত হাস্যে গান্ধর্বী বললেন—অবশ্যই পারেন। অজ্ঞাত দেশ কৌতূহলের উদ্রেক করে বলেই মানুষ পর্যটনে অভিলাষী হয়। জ্ঞানীরা দেশ ভ্রমণ দ্বারা তাঁদের জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেন। আপনি আমাদের অতিথি। ইচ্ছামত প্রশ্ন করুন। দ্বিধার কারণ নেই। অনুমতির অপেক্ষাই বা কেন?

—দেবী! আপনাদের দেশ ক্ষুদ্র। জন সংখ্যাও অধিক নয়। কিন্তু পণ্য-মণ্ডলীর অস্ত্র বিপণীতে বহু-বিচিত্র অস্ত্র সম্ভার দেখেছি আমি। জন সমাগমও বিস্ময়কর। আমি বিস্মিত বোধ করছি এই চিন্তায় যে এই ক্ষুদ্র রাজ্যে এত উন্নত মানের মারণাস্ত্রের প্রয়োজন কি?

—যে কারণে অস্ত্রের প্রয়োজন হয়—যুদ্ধে।

—যুদ্ধ! আপনারা কি কোনও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন?

শান্তিময় এই দেশে রক্তপাত কি আসন্ন—অথবা মণিপুররাজ স্বয়ং যাত্রা করবেন দিগ্বিজয়ে ?

মুখাকৃতি গম্ভীর হল। অপ্রসন্ন স্বরে তিনি বললেন,—দিগ্বিজয় আমরা ঘৃণা করি পথিক। রাজ্যবিস্তারের নামে পররাজ্য ধর্ষণ পরস্বাপহরণেরই তুল্য। এই পর্বতাঞ্চলে অনেক জাতি পাশাপাশি বাস করে। তারা একে অপরকে কদাচ আক্রমণ করে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকোন্দল হয়তো আছে। কিন্তু সে তাদের নিজেদেরই মধ্যে। রাজ্য সীমা অতিক্রম করে বাহিরে তা বিস্তৃত হয় না কদাচ এবং সে কোন্দলের সমাধানও তারা নিজেরাই করে।

—তাহলে এত অস্ত্র সংগ্রহ কেন ? সেই অস্ত্র ধারণ করবার জন্য প্রশিক্ষিত বিশাল সেনাদল পোষণেরই বা উদ্দেশ্য কি ?

—যুদ্ধের অর্থ কেবল আক্রমণ নয় বিদেশী, আত্মরক্ষার জন্যও যুদ্ধ করতে হয়।

—তবে কি আপনারা আক্রমণের আশঙ্কা করছেন ? কে আপনাদের শত্রু ?

—আপাততঃ কেউ নেই। তথাপি প্রস্তুত তো থাকতেই হয়। সুশিক্ষিত বিশাল সেনা মণিপুরে নেই, পোষণের প্রয়োজনও নেই। আমরা নাগরিকরাই আমাদের সেনা। নর-নারী নির্বিশেষে মণিপুর নাগরিক অস্ত্র ধারণে সমর্থ।

নারীরাও ! বিস্মিত কণ্ঠে অর্জুন বললেন,—নারীরা অস্ত্র ধারণ করেন ? কেন ? মণিপুরের পুরুষ সমাজ কি নির্বীর্য্য, তাঁদের বাহু কি বলহীন ? রাজ্যের রক্ষায় তাঁরা অশক্ত—তাই অন্তঃপুরচারিণীদের বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করতে হয় তাঁদের ?

—আমরা অন্তঃপুরচারিণী নই। মৃদু হাসলেন গন্ধর্ববালা। আপনি নবাগন্তুক, আপনার পক্ষে জানা সম্ভব নয়, মণিপুর সমাজে স্ত্রী-পুরুষে ভেদ বিশেষ নেই। গন্ধর্বেরা মাতৃতান্ত্রিক জাতি। মহিলারা এখানে পুরুষের মতই সম-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিতা। আর মর্যাদা অর্জন করতে

হয় ভদ্র—রক্ষাও করতে হয় আপন যোগ্যতা বলে। যেহেতু আমরা স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিতা—সেই হেতু সমাজের সকল কর্মভারও সমভাবেই বহন করতে হয় আমাদের।

—স্বাধিকার! রমণীর স্বাধিকার! কিন্তু স্ত্রী জাতির স্বাধীনতায় ধর্মের অনুমোদন নেই দেবী।

—ধর্ম!—দ্বিধাহীনতায় শাণিত শোনাল তাঁর কণ্ঠস্বর।—ধর্ম আচরণ করতে হয় ভদ্র। হৃদয় এবং আত্মাকে অতিক্রম করে কোনও ধর্ম নেই। আপনাদের ধর্মের কথা আমি তেমন কিছু জানি না, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি—সেই ধর্মই শ্রেষ্ঠ যা মানবিক। সেই অনুশাসনই অনুসরণযোগ্য মানুষের মূল্য আর মর্যাদাবোধকে যে প্রতিষ্ঠিত করে। বসুমতী বিপুলা, জীবনের বৈচিত্র্যও অন্তহীন, সেই জীবনের যাথার্থ ধারণ করে যে সেইতো ধর্ম। অন্ধ, উদারতাহীন, আচার সর্বস্ব অনুশাসনের কোনও অর্থ নেই—এমন কি ঋষিবাক্য হলেও না।

বিদায় প্রার্থনা করলেন গান্ধর্বী।

ব্যাকুল কণ্ঠে অর্জুন বললেন—আর এক মুহূর্ত—মুহূর্ত মাত্র অপেক্ষা করুন দেবী,—আর একটি মাত্র প্রশ্ন—আপনারা, গন্ধর্ব নারীরা কি তাহলে স্বেচ্ছাচারিণী? অথবা কূট পর্বত কিংবা ঘোরারণ্যবাসিনী নিশাচরীদের মত কামাচারিণী?

স্বকীয় মর্যাদার দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠল তাঁর মুখ। গর্বিত স্বরে তিনি বললেন—আমরা স্বতন্ত্রচারিণী। আমরা কারও অধীন নই, কেউ অধীন নয় আমাদের অনুশাসনে। সমাজ এবং স্বজনের সঙ্গে আমরা হৃদয় বন্ধনে মাত্র আবদ্ধ। আগন্তুক! আপনি উৎকৃষ্ট মনে করতে পারেন এই রীতিকে অথবা নিকৃষ্ট—অথবা কিছুই না মনে করে উপেক্ষাও করতে পারেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি মানুষ তার কর্ম বুদ্ধি ও চৈতন্য দ্বারাই শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট হয়। আপনারা আর্য্য দেশীয়রা পত্নীকে বলেন অর্দ্ধাঙ্গিনী, কিন্তু সে কেবল

ধর্ম ও কামার্থে। পুত্রোৎপাদনের জন্য আপনারা ভার্য্যা গ্রহণ করেন। পুত্র প্রয়োজন হয় পুন্নাম নরক ত্রাণে। ভর্তা ভার্য্যাকে ভরণ-পোষণ দেন, ভার্য্যা সে ঋণ পরিশোধ করেন আনুগত্য ও অপত্য উৎপাদন দ্বারা। জাগতিক স্নেহ, শ্রদ্ধা, বিশ্বাসের বন্ধন এখানে কোথায় ?

প্রতিবাদ করলেন অর্জুন,—এ আপনার ভ্রান্ত ধারণা দেবী। হৃদয়ের অতি উচ্চাসনে নারীকে স্থান দিয়ে থাকি আমরা। নারী মাত্রেই মাতৃসমা—দেবী।

হাসলেন তিনি। সস্নেহ কৌতুকচ্ছটা বিকিরিত হল সে হাসিতে। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন,—কিন্তু তাঁরা তো মানবী। কখনও কি জানতে চেয়েছেন ভদ্র, সমাজের আরোপিত এই দেবীত্বে তাঁদের আগ্রহ আছে কি না ? মাতৃত্ব এক জীবন-সত্য। জন্ম ও জনন সূত্রে জাতক ও জননীর মধ্যে তা স্বাভাবিক সত্য। কল্পিত অস্বাভাবিক এই বিশ্বমাতৃত্ব বহনে তাঁরা সম্মত কিনা—সে কথা কি কেউ জিজ্ঞাসা করেছে তাঁদের ?

বিভ্রান্ত বোধ করছিলেন অর্জুন। এমন কথা তিনি কখনও শোনেন নি। এমন অদ্ভুত যুক্তিজাল ও বিচারধারাও তাঁর অজ্ঞাত। তথাপি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন নিজমত—সমাজের কল্যাণে—অথবা হয়তো নারীদের পবিত্রতা রক্ষা করবার জন্য প্রয়োজন হয়েছে এই ব্যবস্থার—

পবিত্রতা রক্ষার জন্য !—বাধা দিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে তিনি বললেন—আপন পবিত্রতা তাঁরা কি নিজেরাই রক্ষা করতে পারেন না ?

—তাঁদের পারবার প্রয়োজন কি ? আমাদের বাহু তো বলহীন নয়। ভূমি বিত্ত ও গোধনের মতো আমাদের নারীদেরও আমরাই রক্ষা করি।

—অর্থাৎ ভূমি, বিত্ত ও গোধনের মতো নারীরাও এক পার্থিব সম্পদ বিশেষ। অর্থাৎ—আপনাদের নারীদের সুরক্ষা নিতান্তই পুরুষের বীর্য্য নির্ভর। না পথিক—অন্ততঃ এই মুহূর্ত্তে এই ব্যবস্থার

প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাতে পারলাম না। পর নির্ভর সুরক্ষা কখনই আত্মরক্ষা হয়ে উঠতে পারে না। আমরা অনার্য্য নারীরা আত্মরক্ষার দায় নিজেরাই বহন করি। তা সে হোক দৈহিক পবিত্রতা—অথবা চিত্তগত। কাল পরিবর্ত্তনশীল। বসুমতী বিপুলা—হয়তো কোনও দিন এ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটবে। অনার্য্য সমাজেও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে পুরুষের। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সে কথা আমরা কল্পনা করি না। এখনও পর্যন্ত আমরা স্বতন্ত্র। বন্ধন স্বীকার করি তখনই—যখন সে বন্ধন হৃদয় সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়। কোনও ধর্মীয় অনুশাসনে শাসিত হয়ে একপক্ষের প্রভুত্ব এবং অপরের উপায়হীনতার উপযোগে নয়।

রৌদ্র প্রখর। মধ্য-গগন শায়ী সূর্য্য অগ্নি বর্ষণে ব্যস্ত। রাজপথে জনসমাগম স্বল্প হয়ে এসেছে। দ্বিপ্রাহরিক আলস্য তার অঞ্চল প্রসারিত করেছে ইতিমধ্যেই।

কিন্তু অর্জুন তখনও চিন্তা মগ্ন। ক্ষণপূর্বের অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার রোমন্থনে স্মৃতি ব্যস্ত। অপরিচিতা নারীর বুদ্ধি-প্রদীপ্ত মুখশ্রী তখনও উদ্ভাসিত চক্ষের সম্মুখে। কর্ণে-ধ্বনিত হচ্ছিল তাঁর গর্বিত মধুর কণ্ঠস্বর। বিদায় নেবার আগে তিনি পুনরায় বলেছিলেন,—মানুষের নীতি নিয়ম কল্যাণকে আশ্রয় করেই পরিবর্দ্ধিত হয়। আগন্তুকের কাছে অনেক সময়ই তা অরুচিকর মনে হতে পারে। শ্রদ্ধাযুক্ত দর্শন এবং মননের মাধ্যমেই আপাতঃ সে বাধা দূর হওয়া সম্ভব। ভগবান ভবানীপতির কাছে প্রার্থনা করি আপনার বাধা দূর হোক। শ্রদ্ধাযুক্ত দর্শনের সৌভাগ্য যেন লাভ করতে পারেন আপনি।

অভিভূত বোধ করছিলেন তিনি। যুগ যুগ সঞ্চিত সংস্কারের মূলে আঘাত পড়েছে, কিন্তু ঘৃণা করতে পারছেন না।

স্বতন্ত্রচারিণী নারী···! চিন্তাতেই অস্বস্তি বোধ হয়। তাঁর জানিত ধর্ম এবং বিধি বহির্ভূত ব্যবস্থা। স্ত্রী-পুরুষের যে অবাধ তথা একত্র

সঞ্চরণ দেখছেন তিনি এই মণিপুরে এসে—সনাতন ধর্মের কোনও বিধানে তা অনুমোদিত নয়। তথাপি অন্তরের অন্তস্তলে কেন জাগরিত হচ্ছে না বিতৃষ্ণালেশ ?

না মহাজ্ঞানী ঋষিগণ মিথ্যা বলেছেন এমন কথা ভাবতে পারেন না তিনি। আদি পিতা মনুর অনুশাসনও অর্থহীন নয়। তথাপি সত্যেরও বোধহয় প্রকার ভেদ হতে পারে। সময় কিংবা অবস্থা বিচারে হতে পারে ভিন্ন রূপ, ভিন্ন অর্থ। শীতার্ত্তের কাছে যা সত্য, তাপিতের তা নয়। দুর্বলের সত্যকে বলবান কখনই শিরোধার্য্য করবে না।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন তিনি। যে নির্বাসনকে একদা দৈবদত্ত অভিশাপ বলে মনে করেছিলেন, সেই নির্বাসনই এই পরম দর্শনের সৌভাগ্য এনে দিয়েছে তাঁকে। অন্যথায়—কেমন করে দেখা হত এই দেশ, এইসব মানুষ—বহুদূরে লোকচক্ষুর অন্তরালে, অরণ্যচ্ছায়ায় দৃষ্টি মন বুদ্ধির অগোচরে পালিত-প্রবাহিত বিশাল, বিচিত্র সুপ্রাচীন এই জীবন প্রবাহ ?

এবং—এখন তিনি বুঝতে পারছিলেন—সম্ভবতঃ এই জন্যই মণিপুর এত সমৃদ্ধ। ক্ষুদ্র হলেও এর শ্রী এত নয়নাভিরাম।

মাতৃতান্ত্রিক !—ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন তিনি। তিনি স্পষ্ট জানেন না মাতৃতান্ত্রিকতা কি ? তবে প্রসঙ্গ উল্লেখে নাসিকা কুঞ্চিত করতে দেখেছেন অনেককেই। এ নাকি অনার্য্য ব্যবস্থা। অস্পষ্ট এক ধারণা অবশ্য তাঁর আছে। মাতার পরিচয়েই নাকি সন্তানের পরিচয় নির্দ্ধারিত হয় এ ব্যবস্থায়। তিনি অবশ্য বুঝতে পারেন না এ ব্যবস্থার মধ্যে অধর্ম কোথায়।

সন্তানের উপরে মাতার অধিকার কি পিতা অপেক্ষা অধিক নয় ? একান্তভাবে মাতৃপালিত বলেই বোধকরি তাঁরা পঞ্চভ্রাতা এ বিষয়ে কোনও বদ্ধমূল সংস্কারে আবদ্ধ নন। তিনি স্বয়ং পার্থ নামে পরিচিত হতে গর্ববোধ করেন। দেবতারাও তাঁদের মাতা অদিতির নামানুসারে

'আদিত্য' পরিচয়ে পরিচিত হয়েছেন। দনু হতে সৃষ্ট দানব এবং মহাবল, মহাকায়, বিষ্ণু-বিজেতা বৈনতেয় গরুড়ের নাম কে না জানে?

অন্তরে অন্তরে তীব্র গভীর এক আকাঙ্ক্ষা বোধ করছিলেন— মিত্রতা করা যায় না এই জাতির সঙ্গে? স্ব-নির্ভর আত্মমর্য্যাদা সম্পন্ন রণ-কুশল জাতি। শুনেছেন নানা দিব্যাস্ত্রও আছে এদের; এবং অধিকাংশ অনার্য্য জাতির মত মায়া যুদ্ধেও এরা নিপুণ। যদিও আশা বিশেষ করা যায় না। কারণ প্রথমতঃ অনার্য্য জাতিগুলি কিছু আত্মকেন্দ্রিক হয়। আপনার মধ্যে আপনি সীমাবদ্ধ থাকতে অভ্যস্ত তারা। দ্বিতীয়তঃ বর্বর বোধে সমতলের অধিবাসীরা এতকাল ঘৃণাই করেছে এদের এবং এরাও তাদের সম্বন্ধে বিদ্বিষ্ট। তথাপি চেষ্টা করতে ক্ষতি কি? রাজ্য বিস্তার এবং বল বর্দ্ধনের মত উত্তম মিত্র সংগ্রহও তো রাজধর্মে স্বীকৃত।

দীর্ঘ দুর্গতি ভোগের পর পৈত্রিক রাজ্যের অর্দ্ধাংশ লাভ করেছেন তাঁরা। লাভ করেছেন—কিন্তু কতদিন তা নিষ্কণ্টকে ভোগ করতে পারবেন সে বিষয়ে নিশ্চিত নন তিনি। শত্রু প্রবল—প্রবলতর হচ্ছে প্রতিদিন। দুর্য্যোধনের দুরাচার প্রশমিত হয়নি আজও। অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের শাসনে অক্ষম। যে কোনও মুহূর্ত্তে মত মতি পরিবর্ত্তিত হতে পারে কৌরবদের। সর্বোপরি অগ্নির সঙ্গে যেমন বায়ু—তেমনই দুর্য্যোধনের সদা জাগ্রত ঈর্ষানলে সতত আহুতি দিয়ে চলেছেন সূতপুত্র কর্ণ ও গান্ধার-রাজনন্দন সৌবল শকুনি। মনস্বিনী মাতা গান্ধারীর তিনি সহোদর। কিন্তু ভগিনীর চরিত্রের অলৌকিক গুণরাশির কণামাত্রও তাঁতে অনুপস্থিত। শুনেছেন মাতা গান্ধারীর সঙ্গে তেমন সদ্ভাব নেই তাঁর। লজ্জাহীন সুবল নন্দন তথাপি বাস করছেন ভগিনী গৃহে। নিজ রাজ্যের সকল ভার বৃদ্ধ পিতার স্কন্ধে ন্যস্ত করে, দরিদ্র মরুকান্তার তুল্য স্বদেশ এবং সদা বুভুক্ষা পীড়াতুর প্রজা পরিজনদের পরিত্যাগ করে হস্তিনার রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করছেন। দুর্য্যোধনের চাটু বৃত্তি ও সাম্প্রতিককালে পাণ্ডবের অনিষ্টচিন্তাই একমাত্র কর্ম তাঁর।

তথাপি শকুনিকে বোঝা যায়। দুর্যোধন তাঁর আপন ভাগিনেয়। ভরত বংশের দীপ্যমানা রাজশ্রী তার করায়ত্ত হোক—মাতুল এ কামনা করতেই পারেন। ভগিনীপতির অন্ধত্বের কারণে—তাঁর যে সহোদরা রাজ্ঞীপদ লাভ করতে পারেন নি, দুর্যোধন রাজচক্রবর্ত্তী হলে তিনি রাজমাতার মর্য্যাদা প্রাপ্ত হবেন—অতএব শকুনির পক্ষে দুর্যোধনের পৃষ্ঠপোষকতায় অস্বাভাবিকতা কিছু নেই।

কিন্তু কর্ণ দুর্বোধ্য তাঁর কাছে।

রহস্যময় এই অজ্ঞাত পুরুষের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হস্তিনার অস্ত্র-পরীক্ষা প্রাঙ্গণে। অনন্য সাধারণ রূপ ও বিশাল ব্যক্তিত্বচ্ছটায় সকলকে সম্মোহিত করে সভাস্থলে তাঁর সেই অকস্মাৎ আবির্ভাব মূহূর্ত্তটি অদ্যাপি স্মরণ করতে পারেন তিনি। আচার্য্যের অনুমতি লাভ করে তিনিও নিজ শিক্ষা প্রদর্শন করেছিলেন সেদিন।

আপদ উপস্থিত হয়েছিল তার পর। কর্ণের বাহুবল এবং অলৌকিক অস্ত্রশস্ত্রের পরিচয় পেয়ে উল্লসিত দুর্যোধন সেই সভাস্থলেই মিত্রতায় আবদ্ধ হয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে এবং উপহার স্বরূপ অঙ্গরাজ্য দান করেছিলেন।

কোন অধিকারে করেছিলেন তা কেউ জানে না। রাজ্যের অধিকারী তিনি নন। সম্মুখেই উপস্থিত ছিলেন তাঁর অন্ধ পিতা এবং অতি বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম। তাঁদের অনুমতি ব্যতিরেকে ভরত সাম্রাজ্যের একখণ্ড ভূমিও কাউকে দান করতে পারেন না তিনি। কিন্তু সর্ব সমক্ষেই অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন তিনি বন্ধুকে। প্রতিবাদের একটি শব্দও উচ্চারিত হল না অগণ্য-পৌরজন সমাকীর্ণ সেই সভা থেকে।

সেই হয়েছে শুরু। দুর্যোধনের প্রশ্রয়-প্রচ্ছায়ে রোপিত হয়েছে পাণ্ডব-বৈরীতার বিষবৃক্ষ। কোনও কারণ নেই, তথাপি পাণ্ডবের চিরবৈরী কর্ণ। পাণ্ডবেরা তাঁর বিন্দুমাত্র অনিষ্ট করে নি, তথাপি ভ্রাতৃ বিরোধের প্রচ্ছন্ন অনলে নিয়ত আহুতি দিয়ে চলেছেন তিনি।

অথচ তিনি ইতর নন। নীচ কুলে জন্ম হলেও চরিত্রে এক আশ্চর্য্য

আভিজাত্যের অধিকারী। আর্তের ত্রাণ শরণাগতের আশ্রয় স্বরূপ। তাঁর দানের খ্যাতি কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে ইতিমধ্যেই।

অস্ত্রবিদ্ কুলাগ্রগণ্য পরশুরামের তিনি শিষ্য। তাঁর বাহুবল অথবা অস্ত্রবলের উৎকর্ষ সম্বন্ধে ইঙ্গিতেও অনাস্থা প্রকাশ করবার স্পর্দ্ধা এই ভারতভূমে কার আছে! তথাপি অত্যন্ত নীচের মত বয়স এবং অভিজ্ঞতায় কনিষ্ঠ অর্জুনের সঙ্গে সর্বদা প্রতিস্পর্দ্ধা প্রকাশ করে থাকেন তিনি। এই আচরণের ফলে লোকচক্ষে তিনি যে নিজেই হেয় হন, সেকথা কি কেউ তাঁকে বুঝিয়ে দেয় না?

দুর্যোধন একখণ্ড রাজ্য দান করে ক্রয় করেছেন তাঁকে—আর তিনি এইভাবে—অবিরাম এই পাণ্ডব বিরোধিতায় পরিশোধ করছেন সেই কৃতজ্ঞতার ঋণ।

কৃতজ্ঞতা!—

ক্ষুব্ধ—বেদনাময় এক হাসি দেখা দিল অর্জুনের অধরোষ্ঠে।

বসুমতী বিজয় করবার শক্তি যাঁর করাঙ্গুলীতে নিহিত—মুষ্টিভিক্ষা অঙ্গরাজ্যের বিনিময়ে নীচ কৌরবের দাসত্বপাশে আবদ্ধ থাকবেন তিনি আর কতকাল?

বৃকোদর চিন্তিত থাকেন ইদানীং। নিদারুণ কর্ণভয় যুধিষ্ঠিরকে প্রায় জড়ত্বের প্রান্তে উপনীত করেছে। আপন বাহুবলের উপরে যথেষ্ট আস্থা থাকা সত্বেও, সে ভয়কে অহেতুক বলে মনে করতে পারেন না অর্জুন নিজেও।

এমন কি কথাচ্ছলে কখনও কর্ণ প্রসঙ্গ আলোচিত হলে মাতা কুন্তীর মুখেও এক বিচিত্র ব্যাকুলতা লক্ষ্য করেছেন তিনি।

কেন? জননীও কি কর্ণকে ভয় করেন?

দুর্ভাগ্য পাণ্ডবের!—

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন অর্জুন।

সিংহ-সদৃশ এই পুরুষকে স্বপক্ষে লাভ করতে পারলে সুরপতি ইন্দ্রেরও অভিমান চূর্ণ করতে পারতেন তিনি।

দুর্ভাগ্য কর্ণেরও—

তাঁর একটিমাত্র প্রীতিস্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে চিরবশ্যতাপাশে আবদ্ধ হত যে পঞ্চভ্রাতা—বৈরী বোধে তাদের তিনি কেবল নির্যাতনই করে গেলেন।

কিন্তু কেন?—

অর্জুন চিন্তা করেন—চেষ্টা করেন উপলব্ধি করতে। কেন কর্ণের এই পাণ্ডব বৈরীতা? মর্মে মর্মে নিহিত ভয়ঙ্কর এই অর্জুন-বিদ্বেষ?

সে বিদ্বেষ এত করাল এতই তীব্র—যে মনে হয় দু-জনের মধ্যে যে কোনও একজনের মৃত্যু ব্যতীত বুঝি অবসান অসম্ভব তার।

চরিত্রে অশেষ অসংখ্য সদগুণের অধিকারী—তথাপি কর্ণের মত এত তীব্র বিকারগ্রস্ত পুরুষ জীবনে আর দ্বিতীয় কি দেখেছেন তিনি?

শুনেছেন বটে একসময় কর্ণও দ্রোণশিষ্য ছিলেন কিছুকাল। সর্বকালে দ্রোণশিষ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের তীব্র বাসনা ছিল তাঁর। সেই বাসনার বশবর্তী হয়ে একদা নির্জনে গোপনে গুরুর কাছে তাঁর ব্রাহ্মী অস্ত্র প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু গরিয়সী ব্রহ্মবিদ্যা সূতপুত্রের প্রাপ্য হতে পারে না। অতএব আচার্য্য প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তাঁকে।

প্রত্যাখ্যাত কর্ণ অভিমানে দেশত্যাগ করে সুদূর মহেন্দ্র পর্বতে উপস্থিত হয়ে গ্রহণ করেছিলেন ভৃগুনন্দন পরশুরামের শিষ্যত্ব।

এই কি তাহলে কারণ?

তিনি যা পারেন নি অর্জুন তা অর্জন করেছেন। প্রার্থনা করতে হয় নি, সেবাতুষ্ট গুরু স্বয়ং প্রসন্ন হয়ে দান করেছেন ব্রাহ্মী বিদ্যা। স্বীকার করেছেন দ্রোণ-শিষ্যগণের মধ্যে অর্জুনের অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠত্ব।

সেই ঈর্ষাই কি উন্মাদ করেছে কর্ণকে?

কার্য্যকারণহীন এই বিদ্বেষের মূল কি সেই অতীত ব্যর্থতার গভীরেই প্রোথিত!

কিন্তু এ কি অক্ষমের ঈর্ষা!

বিবেকবান হয়েও এত নির্বোধ কর্ণ।

শত্রুতা করে কি সত্যকে অতিক্রম করতে পারবেন তিনি?

কেমন করে অস্বীকার করবেন সর্বকালের দ্রোণ শিষ্যদের মধ্যে অর্জুনই সর্বশ্রেষ্ঠ—

—সর্বশ্রেষ্ঠ।···

সহসা স্থির—যেন প্রস্তরীভূত হয়ে গেলেন তিনি। অহং এবং আত্মশ্রদ্ধা সহ সমগ্র অস্তিত্ব যেন আক্রান্ত হল আকস্মিক স্থবিরত্বে। সর্প-স্পর্শবৎ শীতল এক অনুভূতি সঞ্চারিত হল সর্বাঙ্গে।

সর্বশ্রেষ্ঠ?···

মনে হল কর্ণের এই ঈর্ষাবিকৃত মুখচ্ছবি তাঁর অপরিচিত নয়, হিংসার এই উৎকট প্রকাশ দেখে বিস্মিত হওয়া অন্ততঃ তাঁর সাজে না। তিনি নিজেও তো··· !

আঃ—স্মৃতি কি নিষ্ঠুর! ··কি দয়াহীন তার দংশন। কৃতকর্ম কি ভয়ানক ভাবেই না অনুসরণ করে মানুষকে। তার শ্রান্তি নেই, ক্ষান্তি নেই, নিবৃত্ত হয় না—কখনও মুক্তি দেয় না সে।

নিষাদ-কুলপতি হিরণ্যধনুর পুত্র। পতঙ্গ যেমন ছুটে আসে অগ্নির আকর্ষণে—তেমনই দ্রোণাচার্য্যের খ্যাতি—আকৃষ্ট হয়ে ছুটে এসেছিল সে। প্রার্থনা—অস্ত্রশিক্ষা।

প্রার্থনা পূর্ণ হয় নি। ঋষি ভরদ্বাজের পুত্র, ব্রাহ্মণকুলোত্তম দ্রোণ বনচর এক অন্ত্যজ বালককে শিষ্যত্বে বরণ করতে পারেন না।

একলব্য দুঃখ করে নি, কোন অভিযোগও করে নি। যেমন নীরবে এসেছিল তেমনিই নীরবেই আচার্য্যের চরণ স্পর্শ করে চলে গিয়েছিল। জ্ঞানাবধি দ্রোণাচার্য্যই তার সঙ্কল্পিত গুরু। সে সঙ্কল্প হৃদয়ে বহন করে প্রবেশ করেছিল গভীর অরণ্যে। আরম্ভ করেছিল লোকে, কালে অসাধ্য এক একক-অনুশীলন।

দুর্ভাগ্য বশতঃ একদা মৃগয়াকালে সাক্ষাৎ হয়েছিল তাঁদের। দুর্ভাগ্য বশতঃ নিজেকে দ্রোণ শিষ্য বলে পরিচয় দিয়েছিল সে, এবং

হা—পূর্বজন্মার্জিত সেই দুর্ভাগ্যবশতঃই ধনুর্বিদ্যায় তার অলৌকিক উৎকর্ষ প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি।

তারপর কি হয়েছিল?

ঈর্ষায় উন্মত্ত—হিংসাজর্জর মস্তিষ্কের সেই বিষম বিকার আজ কি সুস্পষ্ট স্মরণ করতে পারেন তিনি?

সে সাহস কি আজ আর আছে তাঁর?

কি করেছিলেন? আপন উন্মত্ততায় গুরুকেও অস্থির উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছিলেন কি?

অর্জুনকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের অঙ্গীকার করেও সত্য রক্ষায় তিনি ব্যর্থ হয়েছেন—সে কথা বলেছিলেন। সেই ব্যর্থতার সংবাদ প্রকাশিত হলে সর্বলোকে নিন্দিত, অবমানিত, হৃতমান হবেন তিনি—সেকথাও বারবার স্মরণ করিয়ে তাঁকে উত্যক্ত, ভীত করে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি?

কি ভেবেছিলেন দ্রোণ? তিনি কি ভয় পেয়েছিলেন? ভারতের অনেক বরেণ্য রাজকুলের তিনি আচার্য্য। আরও অনেক কুল-কুমার তখনও ছুটে আসছেন তাঁর খ্যাতির আকর্ষণে। এই অবস্থায় অন্ত্যজ এক নিষাদ বালকের স্বোপার্জিত সাফল্য—যা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্যের কৃতিত্বকেও অতিক্রম করেছে—সেই অলৌকিক শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তির মূলে কুঠারাঘাত করতে পারে বলে বোধ করেছিলেন কি তিনি?

—অর্জুনের নয়, বস্তুতঃ একলব্য কি তাঁর নিজেরই প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল তখন? অতএব বিপদজনক সেই বিষ-কণ্টকটিকে সমূলে উৎপাটন করতেই কি সঙ্কল্পবদ্ধ হয়েছিলেন দ্রোণ?

এবং—একদা অস্পৃশ্য বোধে যাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন নি, সেদিন বহুকাল পরে গুরুদক্ষিণা প্রার্থনা করেছিলেন তারই কাছে।

তাঁকে অদেয় একলব্যের কিছুই ছিল না। তিনি ইঙ্গিত করলে সুরাসুর বাঞ্ছিত সম্পদ আহরণ করে আনবার সাধ্যও তার ছিল। কিন্তু গুরু প্রার্থনা করলেন শুধু তার দক্ষিণ-হস্তের অঙ্গুষ্ঠ।

…এক মুহূর্তের জন্য শিহরিত হয়েছিলেন অর্জুন। বিবেক আর্তনাদ করে উঠেছিল। তিনি স্বয়ং যোদ্ধা—এর পরিণাম তাঁর অবোধ্য নয়। চিরদিনের মত অস্ত্রধারণে অক্ষম হয়ে যাবে এই নিষাদ। আপৎকালে আত্মরক্ষার ক্ষমতাও আর থাকবে না।

পর মুহূর্তেই সেই উন্মাদ হিংসা এসে আবার অধিকার করেছিল তাঁকে।

কি আসে যায়!…

হীনজন্মা, হীনকর্মা ব্যাধ বালক; জন্মসূত্রে দাসত্বই যাদের অদৃষ্ট লিখন। কি আসে যায় তার সর্বনাশে?

তিনি ভরত বংশীয় ক্ষত্রিয়। জয়, যশ এবং পুরুষার্থে তাঁর জন্মার্জিত অধিকার। যজ্ঞের হবিঃ, কুক্কুরের ভোগ্য হতে পারে না। সিংহের সম্পদ শৃগালের প্রাপ্য হয় না কখনও।

অতএব সেই অরণ্যে, সেই অন্ধকারে, হিংসা কলঙ্কিত এক তামসী সন্ধ্যায়—লোকচক্ষুর অগোচরে, নিঃশব্দে অনুষ্ঠিত হল এক নৃশংসতম পাপানুষ্ঠান। প্রসন্ন মুখ, প্রশান্ত দৃষ্টি, অক্ষুব্ধ একলব্য অকম্পিত হাতে গুরুচরণে উপহার দিল তার তরুণ হৃদয়ের আজন্ম লালিত সাধ, তার সাধনা, দুশ্চর তপশ্চর্যায় অর্জিত তার ধনুর্বিদ্যা—তার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ।

হা—ধিক্…! ধিক্ ক্ষাত্রধর্ম, ধিক্ ক্ষত্রিয়ত্ববিকার! জয়লোভী, যশলোভী, কীর্তির লালসায় লালায়িত বর্বরের উন্মত্ততা!…

হায় গুরু!—হা ব্রাহ্মণ! অর্জুন না হয় ঈর্ষায় উন্মত্ত বিদ্বেষ-বিকৃত-বুদ্ধি বালক—তুমি তো শংসিত-ব্রত ব্রাহ্মণ!

তুমি কেমন করে বিনাশ করলে তাকে? কেমন করে হরণ করলে একক সাধনায় অর্জিত তার নিজস্ব সম্পদ—যে সম্পদে তোমার কিছুমাত্র অধিকার ছিল না।

হে ভবেশ,—হে শঙ্কর, ত্রিশূলী, ত্রিলোকী, ত্রিকাল দর্শন! ব্রহ্মা

করো, ক্ষমা করো—সংসার দহনক্ষম তোমার প্রলয়ানলে দগ্ধ করো না ছন্ন-মতি, বিকৃত-বুদ্ধি, পাপ-পরায়ণ এই অর্জুনকে···

রাজপথে সহসা কলগুঞ্জন। চকিত হলেন অর্জুন। অতীত চিন্তায় নির্বাসিত স্মৃতি পুনর্বাসিত হল বর্তমানে। দৃষ্টিপাত করলেন চতুর্দিকে। কি হয়েছে? মধ্যাহ্নের আলস্য-স্তব্ধতা সহসা বিঘ্নিত হল কেন?

পথচারীদের মধ্যে সসম্ভ্রম ব্যস্ততা। পথ ত্যাগ করে স্থানান্তরে সরে যাচ্ছেন অনেকেই। বিক্ষিপ্ত যান ও বাহন ব্যবস্থিত করছেন আরোহীগণ। বিপণী ত্যাগ করে পথে নেমেছেন কিছু বণিক। ইতস্ততঃ স্তূপীকৃত পণ্যরাশি অপসারণ করার জন্য আদেশ দিচ্ছেন অনুচরদের। ঘটনা কি?

দূরে দ্রুত ধাবমান অশ্বখুর ধ্বনি। শ্রদ্ধা সমুৎসুক জনতা সারিবদ্ধ-ভাবে অপেক্ষ্যমান। কেউ আসছেন।

কে আসছেন?
সম্ভবতঃ কোনও রাজপুরুষ হবেন।

কৌতূহলী চিত্তে অপেক্ষারত জনতার মধ্যে স্থান করে নিলেন অর্জুন। উপস্থিতজনের সসম্ভ্রম ভঙ্গি দেখে তিনি অনুমান করতে পারছিলেন—যিনি আসছেন তিনি বিশিষ্ট। সামান্য কেউ নন।

পলকে পলকে নিকটবর্তী হচ্ছে শব্দ। গতির তাড়নায় উৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশি ছড়িয়ে পড়ছে শূন্যে। পলকে পলকে সেই ধূলিজাল ছিন্ন করে অগ্রসর হচ্ছে অশ্ব। ছন্দোবদ্ধ খুর-ক্ষেপে রাজপথ ধ্বনিত। কে এই সুদক্ষ অশ্বারোহী?

পর মুহূর্তেই আকাশ ভেদ করে এক শরীরি বিদ্যুৎ যেন আবির্ভূত হল তাঁর চক্ষের সম্মুখে। দৃষ্টি অন্ধপ্রায়। কী দেখছেন তিনি—! আরোহী নয়, আরোহিণী, পুরুষ নন, ইনি নারী।

কিন্তু একি নারী! প্রজ্জ্বলন্ত বহ্নিবর্ণা। তরলায়িত স্বর্ণ চক্ষু। সুবর্ণ-তরঙ্গিনীর মত ঘন কুঞ্চিত দীর্ঘ স্বর্ণ কেশিনী। মাত্র এক পলক—তিনি সুন্দরী কি কুৎসিতা—তরুণী অথবা অবসন্ন যৌবনা—কিছুই বুঝলেন না অর্জুন। শুধু দেখলেন উল্কাগতি অশ্বপৃষ্ঠে বসে আছেন এক মূর্তিমতী জ্যোতিঃ। কণ্ঠ বিলম্বিত মনিহারে সূর্যকিরণ, প্রখর সূর্যকিরণ তাঁর ললাটে, বাহুমূলে, কপালে, কপোলে। পদনখ থেকে কেশাগ্র পর্যন্ত যেন এক দিব্য বিভায় প্রজ্বলন্ত। উদাসীন দৃষ্টি, অলস বাম হাত অশ্বরশ্মিতে ন্যস্ত। দক্ষিণ হাতে ললাট-লগ্ন চূর্ণ-কুন্তল-দল শাসন করলেন। পথে বুঝি কোনও বাধা পড়েছিল, চকিত ক্ষিপ্রতায় সংযত করলেন অশ্বরশ্মি। অনায়াস দক্ষতায় বাধা অতিক্রম করে চলে গেলেন গন্তব্যে।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে সম্বিত ফিরে পেলেন অর্জুন। চৈতন্য আচ্ছন্ন এখনও। কি দেখলেন—কিছু কি দেখেছেন?

পথচারী এক প্রাচীন তাঁকে স্পর্শ করে বললেন—ভদ্র! আপনি কি অসুস্থ? তাহলে এই বৃক্ষচ্ছায়ায় বসে বিশ্রাম করুন। অনর্থক পথে দাঁড়িয়ে রৌদ্র ভোগ করছেন কেন?

সচকিত হলেন তিনি। কি হয়েছে তাঁর? চক্ষু যেন ছায়াচ্ছন্ন? কণ্ঠ তালু শুষ্ক, মস্তিষ্ক বিবশ। অতি মৃদু এক দুরু দুরু কম্পন উঠে আসছে হৃদপিণ্ড ভেদ করে। স্পন্দিত সর্ব শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে সূচী-বিদ্ধবৎ এক যন্ত্রণা—অনর্গল স্বেদধারায় সর্বাঙ্গ প্লাবিত।

কৌতুক নিগূঢ় মুখে তরল পরিহাস করলেন এক তরুণ; অসুস্থ নন, উনি আত্মবিস্মৃত। দেবী চিত্রাঙ্গদাকে দর্শন করেই আপাততঃ ওঁর এই চিত্ত-বিকার।

চিত্ত বিকার! প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করতে চেষ্টা করলেন অর্জুন। নিজেকে কি এতটাই প্রকাশ করেছেন? মনোভাব কি প্রতিফলিত

হয়েছে মুখের দর্পণে, পরিচয়হীন এই পথচারীরাও উপলব্ধি করতে পারছেন তা ?

গভীর লজ্জা গোপন করতে চাইলেন প্রাণপণে। অস্পষ্ট স্বরে অসংলগ্ন কিছু বলবার চেষ্টা করলেন। বাধা দিয়ে সদয় কণ্ঠে প্রাচীন বললেন,—লজ্জিত হবেন না আগন্তুক। উনি আমাদের রাজপুত্রী চিত্রাঙ্গদা। গন্ধর্ব গোষ্ঠিপতি রাজা বিচিত্রবাহনের কন্যা, এই মণিপুরের ভাবী অধিষ্ঠাত্রীও বটে। শুধু আপনি কেন, ওঁকে দেখে অনেকেরই এমন অবস্থা হয়। শুনেছি দেবতারাও নাকি ওঁর দর্শন কামনা করে থাকেন।

বাক্যালাপের সাধ্য নেই। সত্যই যেন অসুস্থবোধ করেছিলেন তিনি। স্খলিত চরণে—যথা সম্ভব দ্রুত ফিরে এলেন। বৃক্ষচ্ছায়ায় রথ রেখে অপেক্ষা করছিলেন পুরুধান। কম্পিত শরীর, দৃষ্টি এখনও ছায়াবৃত। শরবিদ্ধবৎ আশ্রয় নিলেন রথে। প্রগাঢ় রুদ্ধ স্বরে কোনও মতে বললেন—চল পুরুধান।

॥ ৪ ॥

অবসর নিতে চান মণিপুর রাজ বিচিত্রবাহন। এখন বৃদ্ধ হয়েছেন তিনি। জরার আক্রমণে দেহ বিকল। শুক্ল কেশ, দৃষ্টি ক্ষীণ। ললাটের সারি সারি পলিত বলিরেখায় সময়ের নিষ্ঠুর দংশন চিহ্ন। এখন অবসর নেওয়ারই কাল তাঁর।

দীর্ঘকাল জীবিত আছেন তিনি। সুদীর্ঘ এই আয়ুষ্কালে জীবনের সব কর্ত্তব্য যথোচিতভাবেই সমাধা করবার চেষ্টা করেছেন। পালন করেছেন রাজধর্ম। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রগণ যে দায়ভার তাঁর স্কন্ধে অর্পণ-করে গিয়েছিলেন সাধ্যমত তা বহন করতে কোনও ত্রুটি করেন নি। রাজ্যের সুরক্ষা, সাধুজনের সমাদর, সেনা সংগ্রহ এবং বিচক্ষণ অমাত্য নিয়োগ করেছেন। তাঁর নিযুক্ত মন্ত্রীমণ্ডলী মণিপুরের কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত আছেন সর্বদা। তিনি জানেন রাজার আচরণ প্রজা সাধারণের জীবন যাত্রাকে বিশেষ প্রভাবিত করে। অতএব সাধ্যমত সদাচার এবং ন্যায় বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত থাকবার চেষ্টা করেছেন নিজেও। অতি কঠোর অথবা অতি মৃদুতা দোষে দুষ্ট হতে দেননি প্রশাসনকে। কোষ ও বল বর্দ্ধনে প্রকাশ করেন নি শৈথিল্য। এখন তিনি ক্লান্ত, বানপ্রস্থের বয়সও অতিক্রান্ত প্রায়। এখন অবসর নিতে চান তিনি।

দুঃখ নেই তাঁর। জন্ম-মরণের মত জরা যৌবনও যে জীব জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সে কথা তিনি জানেন। অজ্ঞান শৈশব থেকে অল্প-স্থায়ী কৈশোর—তারপরে আসে যৌবন। মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল। কর্ম, কীর্ত্তি এবং শ্রী—পৌরুষের এই ত্রিবিধ ঐশ্চর্য্য উপনীত হয় যৌবনের হাত ধরে। কিন্তু চিরস্থায়ী কিছুই নয়। নিরবধি কাল তার নিশ্চিত নিয়মে সদা আবর্ত্তিত, বিশ্বজগৎ সেই নিয়মের দাস। মানুষের জীবনের উজ্জলতম দিনগুলিও সেই সময়ের ইঙ্গিতে নির্বাপিত

হয় একদিন। বার্দ্ধক্য বাড়িয়ে দেয় হাত। আয়ু-সূর্য্য অস্তাচল-পথ-গামী হয়, শ্রান্তি এসে গ্রাস করে স্বত্বা। দিনান্তের রক্তরাগ আসন্ন অন্ধকারের বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করে। এখন সন্ধ্যা, শান্তি, নির্জনতা—এখন তাঁর একাকীত্বের কাল।

একাকী থাকতেই ইচ্ছা করেন তিনি। নির্জনে একান্ত বাসে ইষ্ট স্মরণে অবশিষ্ট দিন অতিবাহিত করাই তাঁর সঙ্কল্প। সংসার এখন স্বাদহীন, কর্ম কিংবা কোলাহল দুঃসহ মনে হয়, রাজকার্য্য পরিচালনারও আর সামর্থ নেই। অতএব সব দিক বিবেচনায় কন্যার হাতে রাজ্যভার তুলে দিতে পারলেই এখন সুখী হতেন তিনি।

কন্যা! প্রগাঢ় এক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন বিচিত্রবাহন। এই এক দুর্ভাগ্য তাঁর। তাঁদের বংশের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ রাজর্ষি প্রভঞ্জন থেকে আরম্ভ করে পিতৃ পিতামহরা সকলেই পুত্রবান হয়েছেন। একমাত্র তিনিই ব্যতিক্রম। দীর্ঘকাল নিঃসন্তান জীবন যাপন করার পর পিনাকপাণি শিবের আশীর্বাদে প্রায় বৃদ্ধ বয়সে ওই কন্যাটি লাভ করেছেন তিনি।

সাধারণ মানুষের জীবনে পুত্র-কন্যার পার্থক্য বড় নেই। কিন্তু রাজবংশে পুত্র বড় প্রয়োজন। পুত্র বিনা সিংহাসন অরক্ষিত থাকে, রাজ্যের উত্তরাধিকার হয় সংশয় গ্রস্ত। কন্যা পরস্ব ধন, বিবাহ হলেই পরগৃহে চলে যায়। রাজ্য হয় অরাজক। অরাজক রাজ্য অরক্ষিত মেষ পালের সমান। প্রবলের অত্যাচারে সর্বদাই সশঙ্কিত থাকে, প্রজা পীড়িত হয়, উৎপন্ন হয় কৃষি ও বাণিজ্য। মাৎস্যন্যায় গ্রস্ত মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা হয় অন্তর্হিত। জ্ঞানীরা বলেন অরাজক রাজ্যে দেবতার অভিশাপ নেমে আসে।

রাজকন্যা হলেও তাঁর কন্যা ব্যতিক্রম নয়। বিবাহ হলে সেও পরগৃহে চলে যাবে। তাঁর অবর্তমানে রাজ্য চালনার গুরু দায়িত্ব বহন করবে কে—কার হাতে ন্যস্ত করে যাবেন পিতামহদের গচ্ছিত সিংহাসনের দায়িত্ব—সে কথা চিন্তা করে দীর্ঘকাল কাতর ছিলেন তিনি।

রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল ও প্রজাগণের ভবিষ্যৎ ভাবনায় তাঁর শান্তি যখন বিঘ্নিত প্রায়, ভগবান ভবানীপতির প্রসাদে তখন সমাধান খুঁজে পাওয়া গেছে। বিজ্ঞ মন্ত্রী ও বিচক্ষণ অমাত্যগণের পরামর্শে কন্যাকেই পুত্রজ্ঞান করেছেন তিনি। পুত্রিকা রূপে গ্রহণ করে তাকেই মনোনীত করেছেন রাজ্যের উত্তরাধিকারী। সেই অনুযায়ী তাকে উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করে নেওয়ারও ব্যবস্থা করেছেন।

চিত্রাঙ্গদা হতাশ করে নি তাঁকে। পিতার ইচ্ছার মর্য্যাদা রক্ষার্থে অক্লান্ত চেষ্টায় নিজেকে গঠন করেছে সে। পাঠ করেছে সর্ব্বশাস্ত্র, শিক্ষা করেছে রাজনীতি, কূটনীতি। আয়ত্ত করেছে অশ্বারোহণ, অসিচর্যা যুদ্ধবিদ্যা। এখন উপযুক্ত সে। রাজ্য শাসনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। প্রস্তুত বিচিত্রবাহন স্বয়ং। এই মুহূর্তেই রাজ্যভার হস্তান্তর করে অব্যাহতি লাভ করতে চান তিনি। কিন্তু—

কিন্তু সমস্যা এখনও অবশিষ্ট আছে। এখনও চিত্রাঙ্গদাকে রাজপদে অভিষিক্ত করতে পারছেন না তিনি। এখনও অনূঢ়া সে। বিবাহ মানব জীবনের এক পবিত্র সংস্কার। সে সংস্কার সাধিত না হলে সিংহাসনে অধিকার জন্মায় না। সমর্থা যৌবন প্রাপ্তা কন্যা—বিবাহের বয়স হয়েছে তার। অনেকেই নানা প্রশ্ন করে। রাজা স্বয়ং সমাজপতি। সামাজিক নীতি নিয়ম সর্বাগ্রে তাঁর পালন করা কর্তব্য। তিনি অনাচারী হলে, প্রথা ভঙ্গ করলে সাধারণে স্বৈরাচার অনিবার্য। সম্প্রতি বৃদ্ধ মন্ত্রী ভানুমানও তাঁকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। রাজকুলে যৌবনবতী কন্যা অনেক বিপদের হেতু হতে পারে। বিশেষতঃ চিত্রাঙ্গদা সুন্দরী এবং সর্ব সুলক্ষণ যুক্তা। অবিলম্বে পাত্রস্থ করা প্রয়োজন তাঁকে।

প্রয়োজন যে সেকথা তিনি নিজেও জানেন। তাকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করার অথবা দৌহিত্র মুখ দর্শনের ইচ্ছা তাঁরও প্রবল। কিন্তু সঙ্কট অন্যত্র। ভানুমান সে সঙ্কট জানেন, কিন্তু প্রতিকার তাঁর আয়ত্তে নয়।

পুত্রিকারূপে পালিতা কন্যার বর সহসা পাওয়া যায় না। কারণ এই কন্যা কখনই পতিগৃহে যাবে না। শ্বশুর বংশের পদবী ধারণ বা তাঁদের কুলাচারও পালন করবে না। পিতৃকুলের ধর্মেই প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে তাকে। ইচ্ছা হলে জামাতা এসে শ্বশুর গৃহে বাস করতে পারেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁকেও এই বংশের রীতিনীতি মান্য করতে হবে। চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত পুত্রকন্যাদের উপরেও থাকবে না পিতৃকুলের কোনও অধিকার। বংশানুক্রমে এই মণিপুর রাজবংশের পরম্পরা তথা রক্তধারা প্রবহমান থাকবে তাদের মধ্য দিয়ে। অতএব পিতা বা পিতৃকুলের সঙ্গে তেমন কোন সম্পর্কও স্থাপিত হবে না তাদের।

পৃথিবীতে এমন কোন রাজা আছেন, অথবা রাজপুত্র—নিতান্ত অবমাননাকর এই শর্তে সম্মত হয়ে যিনি বিবাহ করবেন চিত্রাঙ্গদাকে? অথচ কোনও নীচকুলেও বিবাহ দেওয়া যাবে না তার। রাজকন্যা সে—এই মণিপুরের ভাবী অধিকারিণী। রাজকুল—অথবা অনুরূপ কোনও সম্ভ্রান্ত ঘর থেকেই বর আনতে হবে তার।

তেমন সম্ভ্রান্ত বংশ এই মণিপুরে আছে। কিন্তু কোথাও থেকে বিবাহ সম্বন্ধ নিয়ে কেউ দ্বারস্থ হয়নি তাঁর। তাঁরা মাতৃতান্ত্রিক জাতি। কন্যাপক্ষ অধিক সম্মানিত এখানে। প্রচুর উপহার উপঢৌকন দিয়ে পাত্রপক্ষই প্রথমে সম্মানিত করেন কন্যার পিতামাতাকে। বধূ প্রার্থনা করেন তাঁরা। সে প্রার্থনা পূর্ণ হবে কিনা সে কথা কন্যা পক্ষের বিবেচ্য। অতএব তিনি উপযাচক হয়ে যেতে পারেন না পাত্র পক্ষের দ্বারে। প্রথা বহির্ভূত তো বটেই, অত্যন্ত অমর্য্যাদাকরও হয় তা।

রূপে গুণে গরীয়সী কন্যা তাঁর। তথাপি বিবাহ সম্বন্ধ যে এখনও অজাত—তারজন্য চিত্রাঙ্গদা নিজেও কতকটা দায়ী। পার্বত্য জাতির মধ্যে বাল্য বিবাহ নেই, অভিভাবক নির্ভর বিবাহও প্রায়শঃই অনুপস্থিত। প্রাপ্তযৌবন যুবক যুবতীর মধ্যে পরিচয় ও প্রীতির আদান প্রদান হয়, ক্রমে তাদের প্রণয়ভাব অনুমান করে বিবাহের

ব্যবস্থা করেন পিতামাতা। প্রণয় সম্পর্কহীন অভিভাবক নির্ভর বিবাহ যে একেবারে হয় না তা নয়। কিন্তু প্রথমোক্ত প্রথাই সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠরূপে স্বীকৃত এখানে।

তিনি জানেন এই মণিপুরেই সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ কুলশীল সম্পন্ন অনেক যুবক অন্তরে অন্তরে অর্চনা করে তাঁর কন্যাকে। সুপাত্র বিচারে কোনও অংশেই তারা অযোগ্য নয়। তথাপি অজ্ঞাত কোন কারণে সে পূজা তারা নিবেদন করতে পারে নি চিত্রাঙ্গদাকে। কেন পারে নি তা তাঁর বোধগম্য হয় না। অধুনা কালের যুবকবৃন্দকে ভীরু এবং পশ্চাদপদ বলে বোধ হয় তাঁর। তাঁদের যৌবনকালের কথা স্মরণ করেন তিনি। নারী জাতির সঙ্গে ব্যবহারে এমন নীরব উপাসনায় তাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন না। কিঞ্চিত আগ্রাসী হওয়াই পৌরুষের লক্ষণ। প্রণয়ের ক্ষেত্রেও সাহস অবলম্বন করাই নীতি ছিল তাঁদের। সাম্প্রতিক যুবকরা বিবর্ণ তথা বিশীর্ণ। অতিমাত্র ভদ্রতাবোধে পৌরুষ প্রায় নির্বাপিত তাদের। কিঞ্চিত দুর্দ্ধর্ষ পুরুষই নারীদের প্রিয়। সিংহিনী কখনও ফেরুপালে আকৃষ্ট হতে পারে না। অতএব ব্যক্তিত্ব বর্জিত পুরুষে তারা আকর্ষিত না হলে তিনি দোষারোপ করতে পারেন না।

চিত্রাঙ্গদার বিচিত্র মানসিকতাও অনুধাবন করবার চেষ্টা করেন তিনি। বস্তুতঃ কোন কোন বিষয়ে কন্যাকে যেন তাঁর দুর্বোধ্য মনে হয় ইদানীং। তরুণী নারীর স্বভাব সিদ্ধ প্রেম, প্রীতি, রাগ, অনুরাগ তার মধ্যে অনুপস্থিত। যুব-জন-সঙ্গ অপেক্ষা বৃদ্ধ মন্ত্রীর সাহচর্যে তার প্রীতি। আমোদ প্রমোদের অধিক প্রিয় অসিচর্যা বা অশ্বারোহণ। ফলে তার সাহচর্যে এসে প্রণয়বোধের পরিবর্ত্তে এক নির্ঘাৎ সমীহবোধে আক্রান্ত হয় তরুণরা। এক আশ্চর্য নির্মম নির্বেদ-প্রাচীরের অন্তরালে সর্বদা নিজেকে গোপন করে রাখে চিত্রাঙ্গদা। আবাহন আমন্ত্রণহীন হৃদয়-স্পর্শ বর্জিত সেই প্রাচীর অতিক্রম করে তার নিকটস্থ হওয়ার সাধ্য অদ্যাপি কারও হয়নি।

তিনি বিব্রত। কন্যা স্বয়ং যদি অনুরাগিনী না হয়, তিনি কি করে

বাধ্য করবেন তাকে বিবাহে। সমস্যার কথা তিনি মন্ত্রী ভানুমানকেও জানিয়ে ছিলেন। প্রত্যুত্তরে মৃদু হেসে বিদ্বান মন্ত্রী বলেছিলেন,—এর জন্য রাজকন্যাকে দোষারোপ করে কোনও লাভ নেই মহারাজ। সকলের মনের গঠন এক প্রকার হয় না। বিশেষতঃ তিনি শৈশবে মাতৃহারা, চিরকাল নারীসঙ্গ বঞ্চিতা। সমবয়সী ভ্রাতা ভগ্নী কিংবা সখা সখীও তাঁর নেই। পিতার প্রতিপালনে ক্রমাগত পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যাঁর জীবন গঠন, পুরুষ জাতির প্রতি তাঁর হৃদয়ে কোনও মোহ না জন্মানোই স্বাভাবিক। প্রণয় তো মোহেরই আর এক রূপ। আমার মনে হয় তাঁর মাতা জীবিত থাকলে এমন হতে পারতো না। সংসার কিংবা গার্হস্থ জীবন সম্বন্ধে তিনিই উপদেশ দিতে পারতেন দুহিতাকে।

বিচিত্রবাহনও তা জানেন। মাঝে মাঝেই পরলোকগতা মহিষীকে স্মরণ করে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। অধিক বয়সে ওই কন্যাটি প্রসব করেই প্রস্থান করেছেন তিনি। তাঁর স্কন্ধে ন্যস্ত করে গেছেন এই দুর্বহ দায়িত্ব। বিচ্ছেদ সন্তপ্ত হৃদয়ে এখন তিনি সেই দায়িত্ব বহন করছেন, আর প্রতীক্ষা করছেন সময় উপস্থিত হলে কতদিনে সম্মিলিত হতে পারবেন তাঁর সঙ্গে। কিন্তু পিতার সাধ্য কি কন্যার জীবন নিয়ন্ত্রিত করেন। একমাত্র মাতার পক্ষেই সম্ভব তা।

ভানুমান বলেছিলেন,—রাজকন্যা নিয়তই কঠোর কর্মে নিযুক্তা আছেন। আপনার প্রাসাদ আত্মীয় শূন্য। কয়েকজন দাসী এবং সেবক ভিন্ন তাঁকে সঙ্গ দান করবার মত কেউ নেই। প্রাত্যহিক জীবনচর্যার পরে কিছু আমোদ প্রমোদেরও অবকাশ থাকা তাঁর প্রয়োজন। আপনি তাঁর জন্য কয়েকজন সখী সংগ্রহের চেষ্টা করুন। সমবয়সিনী, সৎকুল সমাগতা সেইসব বালিকাদের হাস্য পরিহাসে তাঁর চিত্তের পরিবর্ত্তন ঘটবে বলে আমি আশা করি।

মন্ত্রীর পরামর্শ মতই কাজ করেছিলেন বিচিত্রবাহন। বহু সন্ধান করে শিক্ষিতা, সুন্দরী, সুধাংশুহাসিনী, নৃত্যগীত নিপুণা কয়েকটি তরুণীকে সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন তিনি। তাদের পিতামাতাকে

সম্মত করে কন্যাদের নিয়ে এসেছিলেন রাজপুরে, নিয়োগ করেছিলেন চিত্রাঙ্গদার অবসর বিনোদনের জন্য। তিনি নিজেও প্রসন্নতা অনুভব করেছিলেন। বহুকাল পরে তাঁর শূন্য প্রাসাদ মুখরিত হয়ে উঠেছিল সেই কুমারীদের চপল চরণ ছন্দে, তাদের নৃত্য গীতে, হাস্য পরিহাসে।

কিছুদিন—মাত্র কয়েকটি দিন চিত্রাঙ্গদা সহ্য করেছিল তাদের। তারপরেই শূন্য প্রাসাদ পুনরায় শূন্য হল। কন্যাগণের আকস্মিক অন্তর্ধানে বিস্মিত হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন বিচিত্রবাহন।

উত্তরে গম্ভীর বদনা চিত্রাঙ্গদা বলেছিল পিতা—এই তরুণীরা অত্যন্ত লঘুচিত্ত এবং চপলমতি। বুদ্ধিবৃত্তি নিতান্ত অপরিণত বলেই নিতান্ত প্রমোদ সর্বস্ব জীবন যাপন করে। জীবনের প্রকৃত তত্ত্ব তাদের অজ্ঞাত, জীবিত থাকাব নিহিতার্থও জানে না তারা। অতএব আমি তাদের উত্তম শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা করেছি। রাজকুলের কুলাচার্যদের সমীপে পাঠ গ্রহণ করছে তারা। ক্রমাগত চন্দন লেপন এবং প্রসাধনে যে সময় তারা ব্যয় করে থাকে, পাঠ আযত্ত করলে সেই সমযের সদ্ব্যবহার হবে বলে আমার ধারণা। আমি জানতাম না মণিপুর রমণীদের চিত্তবৃত্তি এত অসার। এখন থেকে নারীদের জীবন গঠনেও আমাদের কিছু মনোযোগ দিতে হবে।

হতচকিত বিচিত্রবাহন বিস্ময়ে প্রায় ব্যদিত-বদন হয়ে আত্মস্থ করেছিলেন আত্মজার এই জ্ঞানগর্ভ ভাষণ। হতচকিত হয়েছিলেন মন্ত্রী ভানুমানও। তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শের এমন বিপরীত ফল তিনি আশা করেন নি।

অতঃপর আরম্ভ হযেছে চিত্রাঙ্গদার নারীচরিত্র গঠনের অভিযান। মণিপুরের অঙ্গনা সমাজকে নিয়ে এখনও ব্যস্ত সে। জীবনের প্রকৃত তত্ব তথা জীবিত থাকার নিহিতার্থে অবহিত করা হচ্ছে তাঁদের। স্বভাবতঃ পরিশ্রমী পার্বত্য নারীরা এখন শিক্ষিত হয়ে উঠছে নানা কর্মে এবং আচরণে। ব্যাপারটি ভাল হচ্ছে অথবা মন্দ প্রথমে তা ভাল করে বুঝতে পারেন নি বিচিত্রবাহন। বিভ্রান্ত হয়ে ভানুমানের সঙ্গে

আলোচনা করেছিলেন। ভানুমান বলেছিলেন,—ক্ষতি কি? নারীরা শিক্ষিত হলে সমাজের উপকারই তো সাধিত হবে। আপনি এ বিষয়ে দুশ্চিন্তিত হবেন না মহারাজ। আমাদের কালে আমরা বিশেষভাবে নারীদের জন্য কিছু চিন্তা করি নি। তার অর্থ এ নয় যে অবস্থা চিরকাল এক রকম থাকবে। রাজকন্যা যদি মনে করেন এদিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন—তাঁকে স্বাধীনতা দেওয়াই ভাল। সমগ্রভাবে গন্ধর্ব জাতির কোনও অনিষ্ট তো এতে নেই। নারীরাও যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গেই স্বীকার করেছেন এই ব্যবস্থা।

অতএব ব্যবস্থা নিয়ে ভাবিত নন বিচিত্রবাহন। কিন্তু তাঁর সমস্যার সমাধান যে দূরস্থ হয়েই রয়ে গেল। চিত্রাঙ্গদার বিবাহের কোনও সম্ভাবনা তিনি অদ্যাপি দেখতে পাচ্ছেন না। অথচ তার বিবাহ হওয়া প্রয়োজন—সম্ভব হলে এখনই, এই মুহূর্তে।

দ্বারী এসে সংবাদ দিল মন্ত্রীপুত্র মণিমান দর্শন প্রার্থী।

মণিমান! কেন? জিজ্ঞাসু চক্ষে দ্বারীর পানে চাইলেন তিনি। মহামন্ত্রী ভানুমানের এই জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে তিনি স্নেহ করেন। চিত্রাঙ্গদার বাল্য সহচর মণিমান। এক গুরুগৃহে অধ্যয়ন তাদের, একই আচার্যের কাছে অস্ত্র শিক্ষা। বিচিত্রবাহন আশা করেন—ভানুমান অবসর নেওয়ার পর তাঁর এই সুযোগ্য পুত্রই গ্রহণ করবে পিতার কর্মভার। অনুপযুক্ত নয় সে। ইতিমধ্যেই নানা উপলক্ষ্যে প্রমাণ করেছে তার যোগ্যতা।

কিন্তু মণিমান তাঁর কাছে কেন? তার প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সে চিত্রাঙ্গদার সঙ্গেই আলোচনা করে সাধারণতঃ। অবশ্য কোনও কারণে মতভেদ হলে বা চিত্রাঙ্গদার অনমনীয় ব্যক্তিত্বের কাছে পরাস্ত হয়ে কখনও কখনও তাঁর শরণ গ্রহণ করেছে সে। আজও সম্ভবতঃ তেমনই কিছু হবে। অথবা—

কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হয়েই দ্বারীকে আদেশ দিলেন তাকে উপস্থিত করতে।

নমস্কার নিবেদন করলেন মণিমান। তার গম্ভীর মুখ দেখেই বুঝতে পারলেন বিচিত্রবাহন,—বক্তব্য লঘু নয়। আশীর্বাদান্তে বললেন —আসন নাও মণিমান। অনুমান করছি কিছু প্রয়োজন আছে তোমার। কোনও দুঃসংবাদ নয় আশাকরি?

আসন গ্রহণ করে মণিমান বললেন,—দুঃসংবাদ নয়, তবে সংবাদ আছে। আমার নিজস্ব নিবেদনও আছে কিছু।

স্মিতহাস্যে বিচিত্রবাহন বললেন,—তোমার নিবেদন? যতদূর জানি তোমার নিবেদন কিংবা নির্বন্ধ চিত্রাঙ্গদার কাছেই নিবেদিত হয় ইদানীং। অকস্মাৎ এই বৃদ্ধকে স্মরণ কেন বৎস?

অপ্রতিভ হলেন মণিমান। লজ্জিত মুখে বললেন,—তাঁর কাছে যা নিবেদিত হয় সেও আপনারই বিষয় মহারাজ, যেখানেই থাকি এ দাস আপনারই সেবায় নিয়োজিত। চিত্রাঙ্গদার কাছে প্রয়োজন সমাধা হলে এতদূরে আসবার আর প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ পিতা বারবার নিষেধ করেন অকারণে আপনাকে উত্যক্ত করতে, আপনার শান্তি ভঙ্গে তাঁর বিশেষ আপত্তি আছে।

—তোমার পিতা ধন্য। আমার বার্দ্ধক্যের স্বস্তির প্রতি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন তিনি। আমাকে সঙ্গদানও করে থাকেন। তাঁর জন্যই এই একান্ত বাসেও আমি একাকী নই। এখন বল বৎস,—কি সংবাদ বহন করে এনেছো?

—মণিপুরে এক নবাগন্তুকের আবির্ভাব ঘটেছে মহারাজ। সঙ্গীদল সহ প্রান্তীয় অরণ্যে আশ্রয় নিয়ে বাস করছেন তিনি।

—আগন্তুক—তাঁর পরিচয়?

—ভরত বংশীয় রাজপুত্র, নাম অর্জুন।

অর্জুন! চমকিত হলেন বিচিত্রবাহন। অর্জুনের নাম তিনি শুনেছেন। ভরতবংশে আরও অনেক রাজপুত্র আছেন। কিন্তু পর-লোকগত রাজা পাণ্ডুর এই পুত্রটি তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাত। সম্প্রতি পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যার স্বয়ম্বরে এক দুরূহ লক্ষ্য বিদ্ধ করে

অলৌকিক কীর্ত্তি স্থাপন করেছেন তিনি। শুনেছেন নানা দেশাগত ক্ষত্রিয় রাজগণ তাঁর কৃতিত্বে ঈর্ষা পরবশ হয়ে বিঘ্ন ঘটাবারও চেষ্টা করে-ছিলেন, কিন্তু এই বীর বাহুবলে পরাস্ত করেছেন তাঁদের। সেই অর্জুন এখানে কেন? স্বদেশ, স্বজন ত্যাগ করে অকস্মাৎ এত দূর-গতির কি প্রয়োজন হল তাঁর? সংশয়াচ্ছন্ন স্বরে সেই প্রশ্নই করলেন,—অর্জুন মণিপুরে কেন মণিমান?

—পরচিত্ত অন্ধকার মহারাজ, তিনি এখানে কেন তা জানি না। তবে শুনেছি তিনি তীর্থ পর্যটন করছেন।

—কিন্তু মণিপুর তো কোনও তীর্থ নয়। কোনও পুণ্যসলিলা নদী অথবা কোনও প্রখ্যাত আশ্রমপদ নেই এখানে। আর্য্য দেশীয় পর্যটকরা পূর্বাঞ্চলে বড় প্রবেশ করেন না। পূর্বদেশ সম্বন্ধে তাঁদের ঘৃণা ও ভীতি আছে। তাহলে তিনি কেন এসেছেন?

মণিমাণ নির্বাক। এ প্রশ্নের উত্তর তিনিও জানতে পারেন নি।

বিচিত্রবাহন বললেন—হিমালয়ের উত্তরণ্য ভূমির অরণ্য মনোরম নয়। হিংস্র জন্তু তথা দংশ-মশক অধ্যুষিত এবং বিপদসঙ্কুল। তাঁর মত রাজপুত্রের বনবাসের পক্ষে নিতান্তই অনুপযুক্ত। যদি ভ্রমণই তাঁর উদ্দেশ্য হয় তাহলে রাজকীয় আতিথ্য গ্রহণ না করে অরণ্যে বাস করছেন কেন তিনি?

অর্জুন অরণ্যবাস করছেন কেন তা মণিমান জানেন। কিন্তু পিতৃসম এই বৃদ্ধের সম্মুখে সে আলোচনায় প্রবৃত্তি ছিল না তাঁর। বললেন,—বিস্তৃত বিবরণ আপনি চিত্রাঙ্গদার কাছেই পাবেন। আপাততঃ আমি এসেছি শুধু তাঁর সম্বন্ধে আপনার মনোভাব জানতে। কিছু সুস্পষ্ট নির্দেশও পেতে ইচ্ছা করি।

—'নির্দেশ—' চিন্তা ব্যাকুল চক্ষু কয়েক মুহূর্ত্ত তাঁর মুখের উপর নিবদ্ধ রাখলেন বিচিত্রবাহন। বললেন—চিত্রাঙ্গদা কি বলে? তার মনোভাব—

—তাঁর মনোভাব তিনি সহসা প্রকাশ করেন না। আপনার

অভিমত না জেনে তো কদাচ না। তথাপি আলোচনা প্রসঙ্গে যা মনে হয়েছে···

—মনে হয়েছে? সহসা তাঁকে নীরব হতে দেখে প্রশ্ন করলেন বিচিত্রবাহন।

কিছুক্ষণ নীরব রইলেন মণিমান। একটু বা ইতস্তত: করলেন। তারপরে বললেন—মনে হয় সমতলের কোন শক্তিমান রাজশক্তির সঙ্গে মিত্রতা করার অভিলাষ তাঁর।

—তেমন অভিলাষ আমারও আছে মণিমান। ভারতের ক্ষত্রিয় রাজশক্তিগুলি অসাধারণ শক্তি সঞ্চয় করেছে। রাজ্যবিস্তারে সকলেই ব্যগ্র। তাদের উপায়ও নেই। ক্রমাগত বর্দ্ধমান বিপুল জন সংখ্যাই রাজ্যবিস্তারে বাধ্য করছে তাদের। আরও অনেক গ্রাম, নগর, কৃষিক্ষেত্র এবং পশুচারণ ভূমি সংগ্রহ করতে না পারলে বিপুল এই জন-গোষ্ঠীর নির্বাহ সম্ভব নয়। আর্য্যখণ্ডে অনধিকৃত ভূমি আর নেই। ফলে তাদের আগ্রাসী দৃষ্টি এখন সমতল অতিক্রম করে অরণ্যে পর্বতে প্রতিষ্ঠিত অনার্য্য অধিকারগুলির প্রতি ধাবমান। এ অবস্থায় কিছু শক্তিমান ও নির্ভরযোগ্য বান্ধব থাকা ভাল।

—শক্তিমান ও নির্ভরযোগ্য বান্ধব বলতে কি বোঝায় আমি তা জানি না মহারাজ।

বিস্মিত হয়ে বিচিত্রবাহন বললেন,—না বোঝার কিছু নেই মণিমান। যাঁদের উপরে আমরা নির্ভর করতে পারবো এবং আপৎকালে যাঁরা আমাদের সাহায্য করতে সমর্থ—আমি তেমন বান্ধবের কথাই বলতে চাই।

অস্পষ্ট—অথচ অতি তীক্ষ্ণ এক শ্লেষ হাসি দেখা দিল মণিমানের অধরে—তেমন বান্ধব পাওয়া গেলে অবশ্যই ভাল। তবে শক্তিমান কোনও দিন দুর্বলের নির্ভরস্থল হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস হয় না।

তীক্ষ্ণ চক্ষে তাঁকে নিরীক্ষণ করলেন বিচিত্রবাহন। বললেন,—

অর্জুন সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য কি মণিমান? আমরা কি তাঁকে আবাহন করে রাজপুরে নিয়ে আসবো?

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের পানে চেয়ে মণিমান বললেন—তার প্রয়োজন? অর্জুন তো আতিথ্য প্রার্থনা করেন নি। উপযাচক হয়ে সৌজন্য প্রকাশ—সে তো চাটুকারিতারই নামান্তর।

—চাটুকারিতা! না, না মণিমান, অথবা হয়তো তাই—তথাপি পাণ্ডবের প্রসন্নতা সম্পাদনে···শুনেছি তাঁরা সদাচার সম্পন্ন ও শিষ্ট। ভবিষ্যতে মিত্রতা গড়ে উঠতে পারে।

—অকস্মাৎ এ প্রসঙ্গ আসছে কেন মহারাজ? পাণ্ডবের মিত্রতায় আমাদের প্রয়োজন কি? যদি শক্তিবৃদ্ধি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ভারতবর্ষে আরও অনেক রাজা আছেন। পাণ্ডবেরা নবোদিত, তাঁরা কোন সাহায্য করবেন আমাদের?

—অন্য কারও সঙ্গে যোগাযোগ করবার সুযোগ তো আমাদের কখনও হয়নি। অর্জুন মণিপুরে এসেছেন। কিন্তু অর্জুনের অভ্যর্থনা কি তুমি অনুমোদন করতে পারছো না মণিমান?

—ক্ষমা করবেন মহারাজ। কোন ক্ষত্রিয় রাজপুরুষকেই মণিপুরে ডেকে আনতে আমার অনুমোদন নেই। তাঁরা অতিমাত্রায় ক্রূর, কলহ পরায়ণ এবং পরশ্রীকাতর। কারও না কারও সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত থাকেন সর্বদা। এই আমন্ত্রণ ভবিষ্যতে সঙ্কটের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

কেন?

—রাজনৈতিক বন্ধুত্ব কখনও একপক্ষীয় হয় না। বন্ধুত্ব হলে আমাদের আপদ বিপদে যেমন তাঁরা সহায় হবেন, তেমনই তাঁদের যুদ্ধ বিগ্রহেও আমাদের সাহায্য করতে হবে। এবং যেহেতু যুদ্ধ তাঁদের প্রায় নিত্যকর্ম—সেই হেতু তাঁদের কারণে গন্ধর্ব জাতিকেও অনবরত লিপ্ত হতে হবে যুদ্ধে। সাধ করে এই সঙ্কট গৃহাগত করবার প্রয়োজন কি?

—বন্ধুত্ব হলেই তাঁদের যুদ্ধ বিগ্রহে আমাদের জড়িত হতে হবে—এমন ধারণার কারণ আছে কি?

—অভিজ্ঞতাই ধারণা সৃষ্টি করে মহারাজ। বিনা স্বার্থে আর্য্যজাতি কোনও দিন অনার্য্যদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে না। সাম্প্রতিককালে অনার্য্যরাও সমর দক্ষতা অর্জন করেছে। শুনেছি আর্য্য রাজারা এখন রাক্ষস, অসুর প্রভৃতি অনার্য্য সেনাপতিদের মান্য করে থাকেন। গন্ধর্বদের রণকুশলতা বিদিত। মণিপুর এখন সমৃদ্ধ। আমার মতে ডেকে এনে কোনও বিদেশীকে এ সমৃদ্ধি দেখাবার প্রয়োজন নেই।

হাসলেন বিচিত্রবাহন। মণিমানের প্রতি স্নেহ এবং তাঁর বাল-কোচিত চিন্তাভঙ্গীর প্রতি কৌতুক যুগপৎ বিচ্ছুরিত হল সে হাসিতে। বললেন,—তোমার এই ধারণার মধ্যে তেমন কোনও সত্ব নেই বৎস। তাঁরা রাজ্য শাসন করেন অন্ধ ও বধির হয়ে নয়। রাজার চক্ষু ও কর্ণ স্বরূপ অনেক বেতনভোগী গূঢ়চর, গুপ্তপুরুষ তাঁদের আছে। রাজ্যের তথা পররাজ্যের প্রতিটি সংবাদ প্রত্যহ রাজার কর্ণগোচর করছে তারা। কোথায় কোন দেশ শক্তিশালী, অথবা কোন রাজ্য উন্নীত হয়েছে সমৃদ্ধির স্বর্ণ শিখরে—সে তথ্য স্বস্থানে বসেই নিয়মিত পেয়ে থাকেন তাঁরা। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির কোষবল, সামরিক সামর্থ তথা অন্যান্য বৃদ্ধি সমৃদ্ধির সংবাদ জ্ঞাত থাকার জন্যই পালন করা হয় এইসব গুপ্তচরদের। তুমি জান তেমন পুরুষ মণিপুরেও পালিত হয় এবং আমাদের প্রতিবেশীদের সংবাদ আমরাও তাদের মাধ্যমেই পেয়ে থাকি। অতএব গৃহস্থের ধনের সংবাদ যেমন তস্করের অজ্ঞাত থাকে না, তেমনি যে কোনও জাতির সমৃদ্ধি সংবাদও এই চরদের কল্যাণেই সর্বদা প্রকাশিত হয়।

অপ্রতিভ বোধ করলেন মণিমান। রাজনীতির এই সাধারণ জ্ঞান তাঁরও আছে। বললেন,—তথাপি আমন্ত্রণ করে এনে রন্ধ্র প্রকাশের প্রয়োজন কি?

কয়েক মুহূর্ত তাঁর পানে চেয়ে রইলেন বিচিত্রবাহন। অন্য রকম

এক বিস্ময়ের আভাস দেখা দিল তাঁর চক্ষে। শান্ত স্বরে প্রশ্ন করলেন —এ বিষয়ে তুমি এত দৃঢ় নিশ্চয় কেন মণিমান, আর কোন কারণ আছে কি এই নির্বন্ধের?

সচকিত হলেন মণিমান। আরও সতর্ক হবার প্রয়োজন আছে এঁর সম্মুখে। বয়স যাঁকে অভিজ্ঞ করেছে, রাজনীতি কূটনীতির সঙ্গে সঙ্গে লোকচরিত্র অধ্যয়নেও তাঁর পটুত্ব স্বাভাবিক। মণিমানের সাধ্য কি আত্মগোপন করবেন তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে।

মুখ ফেরালেন। বাতায়নে চক্ষু রেখে নম্রস্বরে বললেন,—মগধরাজ জরাসন্ধের রীতি প্রকৃতি অনুধাবন করেই আমার এই সতর্কতা মহারাজ।

—জরাসন্ধ! পরলোকগত পুণ্যশ্লোক রাজর্ষি বৃহদ্রথের পুত্র, আর্য্যাবর্তের অমিত প্রতাপ চক্রবর্তী সম্রাট জরাসন্ধ—তাঁর সঙ্গে এ ঘটনার সংযোগ কোথায়?

—প্রত্যক্ষ কিছু নেই, কিন্তু পরোক্ষ সংযোগের সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। মগধপতির চির বৈরী বৃষ্ণি, ভোজ ও যাদব কুলের সঙ্গে পাণ্ডবদের ঘনিষ্ঠতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে ইদানীং। যদু বংশীয় বাসুদেব পাণ্ডু পুত্রদের পরম আত্মীয়। শত্রুর বন্ধুকে মানুষ শত্রু মধ্যেই গণ্য করে থাকে। অতএব পঞ্চ পাণ্ডবের প্রতি জরাসন্ধের মনোভাবও যে প্রীতিপূর্ণ নয় সে কথা অভ্রান্তভাবেই অনুমান করা যেতে পারে।

—জরাসন্ধের সঙ্গে কি তাঁদের কোনও বিবাদ উপস্থিত হয়েছে?

—এখনও হয়নি, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে যে হবে—সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত মহারাজ। অত্যন্ত ক্রুর, প্রতিহিংসা পরায়ণ এবং শত্রু নির্যাতনে সর্বদা উন্মুখ এই সম্রাটের বিষদৃষ্টি অচিরে পাণ্ডবদের প্রতি ধাবিত হবে। পাণ্ডবের যারা বন্ধু তারাও অব্যাহতি পাবে না সে রোষদৃষ্টি থেকে। এক্ষেত্রে অর্জুনের সঙ্গে বন্ধুত্ব আমাদেরও ভবিষ্যৎ সঙ্কটের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

বিস্মিত হলেন বিচিত্রবাহন—এ কি দূর-চিন্তা মণিমান! এ যে প্রায় কষ্ট কল্পনা। এত দীর্ঘ-দর্শনের কি কোনও প্রয়োজন আছে?

—দীর্ঘ দর্শনই তো রাজনীতিব মূল তত্ব মহারাজ। আপনার এবং পিতার কাছে এই সুদূর প্রসারী চিন্তার শিক্ষাই তো লাভ করেছি এতকাল।

কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন বিচিত্রবাহন। দুশ্চিন্তা এবং বিভ্রান্তিব চিহ্ন দেখা দিল তাঁর মুখে। পরে বললেন—সাধারণ সৌজন্য বিনিময়ে দোষ কি? পাণ্ডবের সঙ্গে প্রকাশ্য কোনও বৈরীতা মগধেশ্বরের নেই। আমরাও অর্জুনের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করতে যাচ্ছি না। আতিথ্য মাত্র দেওয়ার অপরাধে জরাসন্ধ রুষ্ট হবেন কেন? মানুষ তো শত্রুকেও সম্ভাষণ করে থাকে।

—আতিথ্য—আতিথ্য মাত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে কি? ঘনিষ্ঠতার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। একবার আমন্ত্রণ দেওয়ার পর আর আপনি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না, এমন কি স্বেচ্ছায় দীর্ঘ-কাল যদি তিনি মণিপুরে বাস করতে চান, তথাপি না।

—প্রত্যাখানের প্রশ্ন কেন? ইচ্ছামত বন্ধু নির্বাচনের অধিকার সকলেরই আছে। মণিপুরেব সঙ্গে খাণ্ডবপ্রস্থের মিত্রতায় মগধপতির কোনও ক্ষতি নেই। তিনি মুর্খ নন।

অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করছিলেন মণিমান। তর্ক কি বড অধিক হয়ে যাচ্ছে। স্বয়ং রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ করবার অধিকাব তাঁর আছে কি? তথাপি এ কথাও সত্য যে নিঃসঙ্কোচ স্পষ্ট ভাষণের নির্দেশও তিনি এই বৃদ্ধ নরপতির কাছে পেয়েছেন। বিশেষতঃ তাঁর নিজের প্রয়োজনেই শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চেষ্টা করতে হবেই তাঁকে। অতএব পুনরায় বললেন—তিনি মূর্খ নন, কিন্তু মদমত্ত এবং অত্যন্ত দাম্ভিক। এই ভারত ভূমির সমস্ত রাজা এবং রাজ পুরুষ সর্বদা তাঁরই প্রীতি বর্দ্ধনে নিযুক্ত থাকবেন এই তাঁর অভিপ্রায়। বস্তুতঃ পূর্বখণ্ডের

সমস্ত নরপতি আজ তাঁর অত্যাচারে ভীতত্রস্ত। তাঁর রোষ উৎপাদনের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও সযত্নে প্রত্যাহার করে চলেন তাঁরা। চেদীশ্বর শিশুপাল তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে মগধের সেনাপতিত্ব স্বীকার করেছেন। কেবল অত্যাচার ভয়েই মহাবল পরাক্রান্ত পৌণ্ড্রক বাসুদেব তাঁর বশ। ভারতের এক চতুর্থাংশে যাঁর অধিকার, যাঁর অলৌকিক কীর্ত্তি কথা দেশে দেশে ভাটমুখে গীত হয়, অমিত প্রতাপশালী দাক্ষিণাত্যপতি সেই ভীষ্মক তাঁকে মান্য করেন। এমনকি স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র যাঁর সখা, অযুত রণহস্তী এবং অসংখ্য চৈনিক সৈনিকে যাঁর বাহিনী বিশাল, আমাদের প্রতিবেশী, প্রাগজ্যোতিষপুরপতি সেই বৃদ্ধ যবনরাজ ভগদত্তও সর্বদা ব্যস্ত থাকেন তাঁর প্রীতি সম্পাদনে।

—ভগদত্ত শান্তিপ্রিয়। জরাসন্ধকে প্রতিরোধ করবার শক্তি তাঁর আছে। কিন্তু সম্ভবতঃ প্রজাদের কল্যাণের কথা চিন্তা করেই তিনি সংঘর্ষে বিমুখ। মহৎ ব্যক্তিরা শান্তিই চেয়ে থাকেন মণিমান। যুদ্ধ আর কবে কোথায় কল্যাণ নিয়ে আসে?

—কিন্তু তাঁর এই মহত্ব জরাসন্ধের চরিত্রে তিলমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাজ্যগুলির উপরে মগধপতির অত্যাচার আজ সীমাহীন। বিন্দুমাত্র বিরুদ্ধাচারণের সম্ভাবনা দেখামাত্র তিনি তাদের ধ্বংস করছেন। চক্রবর্ত্তী সম্রাট পদবী লাভের লোভে ভারতভূমি রক্তস্রোতে প্লাবিত করেছেন তিনি। তাঁর ধারণা সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে তিনিই একমাত্র শক্তিমান।

—তাঁর ধারণা যথার্থ। সত্যই তিনি চিত্রযোধা মহারথ। অষ্টাঙ্গ মল্লযুদ্ধে তাঁর সমকক্ষ ভারতে আর কেউ আছে কিনা আমার জানা নেই। হংস এবং ডিম্ভক নামা তাঁর দুই সেনাপতি সহ তিনি একত্র হলে যুদ্ধক্ষেত্রে দেবতারাও তাঁর সম্মুখীন হতে সংশয় বোধ করবেন। বিশাল রাজ্যসীমা, অপরিমিত কোষবল, শুনেছি তাঁর সত্যব্রত এবং তপস্যায় তুষ্ট হয়ে জননী ভগবতী বসুন্ধরা স্বয়ং তাঁর

অস্ত্রাগারের তত্ত্বাবধান করেন। চক্রবর্ত্তী সম্রাট পদবী দাবী করবার অধিকার তিনি ভিন্ন আর আছে কার ?

—মগধ মণিপুর থেকে অধিক দূরে নয় মহারাজ।

—তুমি কি সম্রাট জরাসন্ধের প্রসন্নতা কামনা কর মণিমান ?

—কদাচ না। আমি তাঁর প্রসন্নতা এবং বীতরাগ—এই উভয় দুর্ভাগ্য থেকেই দূরে থাকতে চাই। কারণ যদিও তিনি সত্যব্রত এবং তপোপরায়ণ, তথাপি তাঁর মত এত মন্দমতি এত পাপবুদ্ধি রাজা এই ভূমণ্ডলে আর দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করেছেন বলে আমার জানা নেই। তাঁর অত্যাচারে শত শত রাজ্য আজ শ্মশানে পরিণত, অসংখ্য নরপতি নিগৃহীত। উত্তর দেশবাসী সমস্ত রাজগণ এবং অষ্টাদশ ভোজকুল উৎসন্ন, শূরসেন, ভদ্রকার, বোধরাজের সন্ধান নেই। মৎস দেশ সহ পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যগুলির নরপতিরা পলায়ন করেছেন। অসুর রাজ শাল্ব রাজ্য ত্যাগ করে আশ্রয় নিয়েছেন সৌভবিমানে, কলিন্দ ও পূর্ব পাঞ্চালের ভূপতিগণ ছিন্ন ভিন্ন, সপরিবার শালায়ন রাজ এবং কোশল-পতিরা আত্মগোপন করেছেন পশ্চিম ভারতের মরু পর্বতে।

—তাঁরা একত্রিত হয়ে তাঁকে প্রতিরোধ করতে পারতেন।

—আপনি স্বয়ং রাজা। আপনার তো অজ্ঞাত নয় মহারাজ, ভারত ভূপতিগণ একত্রিত হবার কথা কখনও চিন্তা করেন না। তাঁরা বিচ্ছিন্ন থেকে ধ্বংস হবেন, তথাপি পরস্পরের বীর্য্য অবলম্বন করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করবেন না। ফলতঃ তাঁরা ধ্বংসই হয়েছেন। ক্ষুধার্ত কেশরী যেমনভাবে মেষপালকে ছিন্নভিন্ন করে, তেমনি ভাবেই জরাসন্ধ তাঁদের নষ্ট ভ্রষ্ট করেছেন। মথুরা নিবাসী ভোজ বৃষ্ণি ও যাদবদের তিনি এমন তাড়না করেছেন যার নিষ্ঠুরতা কল্পনাও করা যায় না। দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, অরণ্য থেকে অরণ্যে, পর্বত থেকে পর্বতান্তরে তাঁদের বিতাড়িত করেছেন তিনি। স্বদেশ তথা স্বরাজ্য থেকে উচ্ছিন্ন, পরাজিত, পলায়িত, অবসন্ন এই যদুকুল শেষ পর্যন্ত আশ্রয়

গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী সমুদ্র পর্বত বেষ্টিত দ্বারকায়।

নিস্তব্ধ বিচিত্রবাহন। বস্তুতঃ মগধেশ্বর এই জরাসন্ধের প্রতি কিঞ্চিৎ দুর্বলতা আছে তাঁর। সুদীর্ঘকালের মধ্যে পূর্বাঞ্চলের এক নরপতি প্রতাপশালী হয়েছেন। কেমন করে যেন তাঁর মনে হয় সমস্ত পূর্ব দেশবাসীরই কিছু অংশ আছে সেই গৌরবে। দীর্ঘ একটি শ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। দ্বিধা জড়িত স্বরে বললেন—কিন্তু জরাসন্ধ তো দিগ্বিজয়ই করেছেন। অনেক রাজাই তা করে থাকেন। জীবনে কখনও না কখনও দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন না দেখেন কোন নরপতি? এতে এত অপবাদ কেন মণিমান? পররাজ্য নিপীড়নই তো রাজ্য বিস্তারের আর এক নাম।

—এই কি রাজ্য বিস্তার মহারাজ! তাঁর অত্যাচারে দক্ষিণের রাজগণ উত্তরে পলায়ন করেছেন, উত্তরের রাজগণ নিক্ষিপ্ত হয়েছেন দক্ষিণ সমুদ্রতীরে। রাজ্যহীন, গৃহহীন, সহায় সম্বলহীন নৃপতিরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; আর তাঁদের রাজ্য অরাজক, দেশ শাসন শূন্য, প্রজারা উৎসন্ন প্রায়। সমস্ত জনপদে আধিপত্য করছে দস্যু, লুণ্ঠক এবং দুষ্ট রাজপুরুষের দল। দিগ্বিজয়েরও তো কিছু নীতি আছে! বিজয়ী সম্রাট কর গ্রহণ করেন, রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন পরাজিত নরপতিরাই। জরাসন্ধ তা করেন নি। রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে রাজাকেও তিনি বিনষ্ট করেছেন। পরিণাম এই প্রজাকষ্ট। সাধারণের দুঃখ দুঃসহ, দিক-দেশাগত বণিক সমাজ আজ আর জরাসন্ধ বিজিত রাজ্যে পদার্পনও করতে চান না। বরং দূর দুর্গম পথ অতিক্রম করে এই মণিপুরে আসতে তাঁরা আগ্রহী। একি সম্রাটের নৃশংসতারই পরিণাম নয়?

—জরাসন্ধ তাঁর বিজিত সাম্রাজ্য শাসন করেন না?

—তাঁর সাধ্য নয় মহারাজ। অন্তরগত প্রবৃত্তি তাড়নায় রাজ্যের পর রাজ্য অধিকার করেছেন তিনি। কিন্তু সেই বিশাল ভূখণ্ডে সমর্থ শাসন প্রতিষ্ঠা করা তাঁর সামর্থের অতীত। সাম্রাজ্য নয়,

বস্তুতঃ বিস্তীর্ণ সেই অধিকারে এক অখণ্ড নৈরাজ্যেরই প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

—উপায় নেই মণিমান। শক্তিমানের ভ্রষ্ট বুদ্ধি যুগে যুগে পৃথিবীতে এমন নৈরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। মানুষের অন্তহীন আকাঙ্খা আর অহঙ্কারই তাকে প্ররোচিত করে এমন সার্বিক বিনাশে। কোনও দৈবাগত শক্তি ভিন্ন বুঝি এর প্রতিকার সম্ভব নয়।

—এখানেই শেষ নয় মহারাজ। এর পরেও আছে অসংখ্য রাজ্য এবং রাজকুলকে দলিত করে শান্ত হয়নি তাঁর শোণিত তৃষ্ণা। পরাজিত রাজাদের উৎসন্ন করেই তিনি তৃপ্ত নন, বন্দী করে এনেছেন তাঁদের, আবদ্ধ করে রেখেছেন মগধ রাজগৃহে। সময় এবং সংখ্যা পূর্ণ হলে ইষ্ট দেবতার সম্মুখে বলিদান দেবেন তাঁদের। রাজরক্তে ধৌত করবেন মন্দির প্রাঙ্গণ।

যেন তড়িৎ স্পৃষ্ট হলেন বিচিত্রবাহন। সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হল। পলকে ললাটে দেখা দিল স্বেদ চিহ্ন। আর্তস্বরে বললেন,—সেকি! একি সত্য? এও কি সম্ভব মণিমান?

—এই পৃথিবীতে সবই সম্ভব মহারাজ। রাজর্ষি বৃহদ্রথের পুত্র—একদা যিনি নিজেও ছিলেন তপস্বী—সেই চক্রবর্ত্তী সম্রাট জরাসন্ধ রাজধর্মে জলাঞ্জলি দিয়ে শরণাগত নৃপতিদের আশ্রয় দানের পরিবর্তে এই অভিচার ক্রিয়ার মধ্যেই খুঁজছেন তাঁর সিদ্ধি। দেবতা কখনও নরবলি চান না। প্রাণের অপচয় ঈশ্বরকে পীড়িত করে—কিন্তু এইসব তত্বকথা উপলব্ধি করবার মত শুভবুদ্ধি এখন আর তাঁর নেই।

—আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য মণিমান—বীর প্রসবিনী ভারত ভূমিতে এমন একজনও কি নেই, যিনি এই অনাচারের প্রতিবিধান করতে পারেন?

—অনেকেই আছেন। কুরুকুল চূড়ামণি ভীষ্ম আছেন, জননী জাহ্নবীর বরে যিনি অজেয় এবং ধনুর্দ্ধরকুলে অগ্রগণ্য। আছেন মদ্ররাজ শল্য, কাশী ও করুষপতি মহাবল ধৃষ্টকেতু, ইন্দ্রসখা, চতুষ্পাদ ধনুর্বেদবেত্তা

ভোজরাজ রুক্মী এবং বঙ্গেশ্বর চন্দ্রসেনও। এঁরা একত্রিত হলে জরাসন্ধকে দমন করতে পারেন। কিন্তু এঁরা তো কখনই পরার্থে অস্ত্রধারণ করবেন না। জরাসন্ধ তাঁদের তো কিছু উত্যক্ত করেন নি। অতএব অত্যাচার যত অসহনীয়ই হোক অপরের জন্য তাঁরা কেন উদ্যোগ গ্রহণ করবেন ? এই পৃথিবীতে প্রবলের প্রতিকার এবং দুর্বলের প্রবোধ বড়ই দুর্লভ মহারাজ।

—হায়! ক্ষত্রিয়-কুল-কৃতান্ত পুরুষোত্তম ভার্গব এখন অস্ত্রত্যাগ করেছেন। একদা ক্ষত্রিয় জাতির অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হয়ে একবিংশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন তিনি। একমাত্র তিনিই সমর্থ এই অনাচারের প্রতিবিধানে।

—এই আদ্যোপান্ত চিন্তা করেই আমি উদ্বিগ্ন মহারাজ। স্বীকার করতে লজ্জা নেই—ভয়ত্রস্তও। দুর্বল কখনই সবলের সঙ্গে স্পর্ধা করতে পারে না। অতএব চক্রবর্ত্তী জরাসন্ধের রোষদৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এমন কিছুই আমাদের করা উচিত হবে না।

চিন্তা স্তব্ধ মুখে মাথা নত করে বহুক্ষণ নীরব রইলেন বিচিত্রবাহন। পরে বললেন,—কিন্তু চিত্রাঙ্গদা,—তাকে অতিক্রম করে আমি কিছুই করতে পারি না। তারও কিছু বিবেচনা আছে।

হতাশ দৃষ্টিতে তাঁর পানে চাইলেন মণিমান। ব্যর্থ তিনি। তাঁর এতক্ষণের এত চেষ্টা কিছুমাত্র প্রভাবিত করে নি এই বৃদ্ধকে। হতাশা দীর্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন,—তাঁকে অতিক্রম করে আপনি কিছুই করতে পারেন না কেন মহারাজ ?

—যে কারণে তুমি পারো না মণিমান। তোমার এই সঙ্গত তর্ক-রাশিও যেহেতু তার কাছে উপস্থিত করতে পারোনি তুমি, তাই এসেছ আমার কাছে। তার ব্যক্তিত্বে একটা অলঙ্ঘনীয় কিছু আছে। কন্যা হলেও আমি তাকে অস্বীকার করতে পারি না। এবং সম্ভবতঃ তোমারও সেই একই অবস্থা।

মাথা নত করে রইলেন মণিমান। কথাটি সত্য। পিতা হয়েও

আত্মজাকে অতিক্রম করতে পারেন না রাজা স্বয়ং। তাঁর নিজের পক্ষে তো তা প্রায় অসাধ্যই।

বিচিত্রবাহন বললেন,—একের বিবেচনা কখনও অন্যের উপরে আরোপ করা যায় না। এ বিষয়ে চিত্রাঙ্গদারও কিছু বিচার আছে। তার মনোভাব না জেনে আমি নির্দেশ দিতে পারি না মণিমান।

—তাঁর মনোভাব—তিনি পাণ্ডব মিত্রতার কথা চিন্তা করেন।

—কারণ?

—কারণ সুনির্দিষ্ট কিছু নেই। আমার মনে হয় বিশেষ কোন গুরুত্ব না দিয়েই সম্ভবতঃ তাঁর সখীব অনুরোধেই তিনি এই—

বাধা দিয়ে বিচিত্রবাহন বললেন,—সখীর অনুরোধে—অর্থাৎ তুমি অর্জুন উলূপী কথার ইঙ্গিত করছো মণিমান?

নির্বাক বিস্ময়ে তাঁর পানে চাইলেন মণিমান। রাজসভা প্রায় ত্যাগ করেছেন, গৃহগতভাবেই থাকেন, তথাপি সুদূর নাগ রাজ্যের সংবাদও রাখেন এই বৃদ্ধ।

হেসে বিচিত্রবাহন বললেন,—বিস্মিত হযো না মণিমান। নাগেন্দ্র কৌরব্য আমার মিত্র, কন্যার সংবাদ তিনিই দিয়েছেন আমাকে। উলূপী কামনা করেছিল অর্জুনকে, অকস্মাৎ একদিন তাঁকে হরণ করে—

অত্যন্ত তিক্ত স্বরে মণিমান বললেন,—হরণ করে! আমি বিশ্বাস করি না। অর্জুন প্রলুব্ধ না হলে কার সাধ্য তাঁকে বল-প্রয়োগে বাধ্য করে? আপনি জানেন কিনা জানি না মহারাজ—এই ঘটনার ফল উলূপীর জীবনে শুভ হয়নি। গোষ্ঠীর বাহিরে বিবাহ নাগেরা সমর্থন করে না। উলূপীর দেবরগণ ইতিমধ্যেই পরিত্যাগ করেছেন তাঁকে। এখন পিতৃগৃহে চির আশ্রিত জীবন যাপন করাই বিধিলিপি তাঁর।

তাঁর এই তীব্রতায় বিমূঢ় বিচিত্রবাহন বললেন,—কিন্তু এতে অর্জুনের অপরাধ কোথায়?

"অবশ্যই অপরাধ আছে কোথাও না কোথাও। এই সমতলবাসী ক্ষত্রিয়রা অত্যন্ত লোভী ও নিকৃষ্টমনা। রাজ্য লোভ ধন লোভের মত নারী লালসাও তাঁদের মজ্জাগত। অর্জুন তার ব্যতিক্রম হতে পারেন না। এমন কি—এক মুহূর্ত যেন ইতস্ততঃ করলেন তিনি—তারপরই অন্তর্নিহিত কোনও আবেগের তাড়নায় পুনঃ উচ্চারণ করলেন,—এমন কি এখানে—এই মণিপুরেও তেমন কোনও ঘটনায় তিনি জড়িত হয়ে পড়লে আমি আশ্চর্য্য হব না। মণিপুর ললনাদের প্রতি সমতল বাসী কোনও ক্ষত্রিয়ের লুব্ধ দৃষ্টি ধাবিত হোক আশা করি আপনিও তা চান না রাজন্।

দুই চক্ষে অপরিসীম বিস্ময়। স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাঁকে নিরীক্ষণ করলেন বিচিত্রবাহন। কিছু একটা যেন বুঝতে পারছেন তিনি। এতক্ষণের এত জটিল বিতর্কের অন্তরাল ভেদ করে প্রকাশিত হচ্ছে অন্য কোনও সত্য। মুখ ফেরালেন তিনি। দৃষ্টিপাত করলেন বাতায়নপথে। কি ভাবে এরা তাঁদের—বৃদ্ধদের—এই তরুণেরা? বয়স হয়েছে বলেই তাঁরা অন্ধ? জগৎ ও জীবনের তাবৎ অভিজ্ঞতাও তাঁদের অস্তমিত হয়েছে যৌবনের সঙ্গে সঙ্গেই?

যুগপৎ কৌতুক তথা বেদনায় বিদ্ধ এক হাসি দেখা দিল তাঁর অধরোষ্ঠে। কি করতে পারেন তিনি? অন্তর্নিহিত যে আকাঙ্খা এবং আশঙ্কার তাড়নায় এতদূরে এসেছে এই যুবক, তা যদি তিনি উপলব্ধি করেও থাকেন—প্রতিকার তাঁর সাধ্যায়ত্ত নয়। শান্ত স্বরে বললেন,—"আমার বিশ্বাস অর্জুনের জন্য চিত্রাঙ্গদার কোনও উৎসাহ তোমার মনঃপুত নয়।

আপাদ মস্তকে শিহরিত হলেন মণিমান। নিরক্ত মুখ। নিজেকে কি প্রকাশ করেছেন তিনি? শত চেষ্টাতেও আত্মগোপন হয়নি যথাযথ। মুহূর্তের উত্তেজনায় অনাবৃত হয়েছে কি কোনও নিভৃত বাসনার মুখ?

শুষ্কস্বরে বললেন,—আমি মনঃপুত না করার কে মহারাজ? আমার সে অধিকারই বা কই?

—অধিকার! হাসলেন বিচিত্রবাহন।—অধিকার কখনও স্বয়মাগত হয় না মণিমান, অধিকার অর্জন করতে হয়। তুমি চিত্রাঙ্গদার বাল্য সখা, তার সকল কর্মের সহচর। কর্মসূত্রে দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় তারই সাহচর্যে অতিবাহিত হয় তোমার। আমার অবর্তমানে এই রাজ্য শাসনের গুরুভার অংশতঃ তোমাকেও বহন করতে হবে। অধিকার তোমার আছে বৈকি। যদিও অর্জুন সম্বন্ধে তোমার এই তীব্র বিতরাগ—যার অনেকটাই হয়তো তোমার ভ্রান্তি। তথাপি আমি বলব নিজের ইচ্ছা তুমি নিজেই প্রতিষ্ঠিত কর। সমস্যা যখন দ্বৈত, তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি তখন অর্থহীন। অতএব তোমার তর্ক চিত্রাঙ্গদার কাছে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে উপস্থিত করার দায়িত্বও তোমারই।

গভীর নির্নিমেষ চক্ষে তাঁর পানে চাইলেন মণিমান। কি বলতে চাইছেন তিনি! অস্পষ্ট কোনও ঈঙ্গিত—অর্থবহ কোনও নিহিত নির্দেশ?

বিচিত্রবাহন বললেন,—অদৃষ্টকেও জয় করে নিতে হয় বৎস। বিজিগীষু না হলে ভূমি, বিত্ত ও নারী থেকে যায় অনায়ত্ত। একমাত্র আগ্রাসী ইচ্ছাই পৌরুষকে পুরস্কৃত করতে পারে—আশাকরি একথা তোমার মনে থাকবে।'

মণিমান নিরুত্তর। শুধু এক পলকের জন্য তীব্র এক আবেগ তরঙ্গ উঠে এল তাঁর তরুণ বক্ষ বিমথিত করে। শোণিতোচ্ছ্বাসে মুখ হল অরুণ বর্ণ। পর মুহূর্তেই আপ্রাণ প্রচেষ্টায় নিজেকে প্রশমিত করলেন তিনি। চিরদিনই তিনি মিতবাক। আজ নিমেষের উত্তেজনায় সে সংযমে যদি ব্যতিক্রম ঘটে থাকে তবে সে দুর্বলতাও ঘৃণার্হ তাঁর কাছে।

বিদায় প্রার্থনা করলেন তিনি। এভাবে আর অধিকক্ষণ এই

বৃদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত থাকা অসম্ভব। এখন তাঁর একটু একান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজন নির্জনে নিভৃতে লোকচক্ষুর অন্তরালে বসে নিজের সঙ্গে কিঞ্চিত পরিচয়। হৃদয়কে কিছু কথা বলতে দিতে চান তিনি।

রাজাকে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলেন নীরবেই।

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন বিচিত্রবাহন। নীরবে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন মণিমানের গমন পথের পানে। হতভাগ্য যুবক! নির্দ্ধারিতকে নিশ্চিত করতে পারে না এরা। প্রাপ্যকে করায়ত্ত করবার সাহস এদের মধ্যে অনুপস্থিত। অকস্মাৎ কন্যার উপরও যেন বড় বিরক্তি বোধ করলেন তিনি। কেন চিত্রাঙ্গদা এত হৃদয়হীনা? সুন্দর, সুকান্তি, চির বিশ্বস্ত এই তরুণটিকে সে কেন পারে না আর একটু স্নেহ করতে! অন্ধ আত্মকেন্দ্রিকতার উর্দ্ধচূড়া থেকে হৃদয়বোধের ভূমিতে উত্তরণ ঘটবে তার কবে?

কি করবেন তিনি এই কন্যাকে নিয়ে!

॥ ৫ ॥

প্রথমে চিন্তিত পরে উদ্বিগ্ন হযে উঠলেন পুরুধান।

কি হয়েছে অর্জুনের ?

পঞ্চপাণ্ডবকে শিশুকাল থেকেই জানেন তিনি। তাঁদের পিতা পরলোকগত মহারাজ পাণ্ডুকেও জানতেন। পুরুধানের পিতা পাণ্ডুর সারথী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর পদভার গ্রহণ করেছেন পুরুধান। পুরুষ-পরম্পরায় তাঁরা ভরতবংশের সেবক।

পাণ্ডব ভ্রাতৃ-পঞ্চকের মধ্যে তৃতীয় এই অর্জুনই তাঁর সমধিক প্রিয়। কিংবা—শুধু তাঁরই নয়—কুরুরাজ্যের প্রজা, দাস, সূত, সেবক, সৈনিকরাও স্নেহ করে তাঁকে। সর্বতোপ্রিয়, সদাপ্রসন্ন, সাহসী ও নম্রভাষী এই তরুণ মানুষকে আকর্ষণ করতে পাবেন। পুরুধান তা দেখেছেন—জানেন।

কিন্তু এখন কি হয়েছে তাঁর ?

গত কিছুকাল যাবৎ বিচিত্র এক বিষণ্ণতায় আক্রান্ত তিনি। বন্ধুসঙ্গ পরিত্যাগ করেছেন, বিজনবাসে অনুরাগ, আহার্যে রুচি নেই, পানপাত্র স্পর্শ করেন না।

এমন কি, মৃগয়াও তাঁকে আকর্ষণ করতে পারে না ইদানীং।

পুরুধান লক্ষ্য করেছেন শরীর শীর্ণ হয়েছে তাঁর, মুখশ্রী কালিমালিপ্ত।

কেন ?

কারণ কি এই আকস্মিক মনোবৈকল্যের ? কোনও ভাবে কি দুঃখ পেয়েছেন তিনি, কোনও আঘাত ?

অপমানিত হয়েছেন—অথবা এসেছে কোনও দুঃসংবাদ ?

কিন্তু পুরুধান জানেন—তিনি নিজেই বুঝতে পারেন সে সব কিছুই নয়। তেমন কিছু ঘটলে সর্বাগ্রে তাঁরই কর্ণগোচর হত তা।

নির্বাসনে প্রস্থানকালে একান্তে আহ্বান করে পাণ্ডব-জননী কুন্তী তাঁকে বলেছিলেন—'বৎস পুরু; সারথী কেবল রথিগণের রথচালকই নন, তিনি তাঁদের সঙ্কটে সহায় এবং আপৎকালে মন্ত্রণাদাতাও বটে। শত্রু-পরিবেষ্টিত সঙ্কুল রণক্ষেত্রে অথবা শ্বাপদসমাকুল দুর্গম অরণ্যে সারথীই রথীদের একমাত্র সহায়। আমার এই পুত্র বয়সে নবীন। অপরিণত বুদ্ধি এবং জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। জন্মাবধি মাতা ও ভ্রাতৃ-গণের স্নেহচ্ছায়ে পালিত। বিচ্ছিন্ন হয়ে কখনও বাস করে নি। এই অবস্থায় অচিন্তিতপূর্ব এই বিপদ উপস্থিত হয়েছে। স্বদেশ ও স্বজন ত্যাগ করে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কাল নির্বাসন ভোগ করতে হবে তাকে। চিরকাল যত্ন-লালিত, সবেমাত্র জাত-যৌবন এই কুমার কেমন করে ব্যতীত করবে এই নির্বাসন বাস। দূর প্রবাসে কোনও সঙ্কট উপস্থিত হলে কে রক্ষা করবে তাকে—এই চিন্তায় আমি নিতান্ত উতলা হয়েছি পুরুধান। বৎস; অভাগিনী এই জননীর মুখপানে চেয়ে তুমি এই যাত্রায় তার সঙ্গী হও—এই আমার অনুরোধ।'

চিন্তিত হয়েছিলেন পুরুধান। এই আশঙ্কাই তিনি করছিলেন। তিনি জানতেন পাঞ্চালী-সম্পর্কিত নিয়ম ভঙ্গ করে নির্বাসনভাগী হয়েছেন অর্জুন। কিছু বিরক্তিও বোধ করেছিলেন। একি নির্বুদ্ধিতা! চিরকালীন প্রচলিত বিধি লঙ্ঘন করে পঞ্চভ্রাতা এক পত্নীতে উপগত হয়েই তো যথেষ্ট সমস্যা সৃষ্টি করেছেন। তার উপরে এই অদ্ভুত নিয়ম! এক সংসারে বাস করতে হলে মাঝে মাঝেই তো ঘটে যেতে পারে এমন দুর্ঘটনা। পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরই বা কিভাবে সমর্থন করলেন এই মূর্খতা?

ভেদ-ভয়ে?

পঞ্চপাণ্ডবের পারস্পরিক প্রণয়-সম্পর্ক যদি সত্য হয়, পত্নীকে উপলক্ষ্য করে ভেদ উপস্থিত হবে কেন ?

তিনি শুনেছিলেন, পাঞ্চালী-পরিণয়ের পর দেবর্ষি নারদ এসে ভ্রাতৃগণের মধ্যে সংস্থাপিত করে দিয়েছেন এই নিয়ম।

নারদের পক্ষে তা সম্ভব। ভবিষ্যতের সমস্যাবাহী এ জাতীয় কূট কর্মে তাঁর দক্ষতা সুবিদিত। আন্তরিক সৌহার্দ্যে বদ্ধ পঞ্চভ্রাতার মধ্যে এমন এক বিজাতীয় নিয়মের প্রবর্ত্তন করে এঁদের প্রীতিভাবনাকেই তিনি অসম্মান করে গেছেন বলে বোধ হয় পুরুধানের।

যুধিষ্ঠিরের কথা চিন্তা করেও আশঙ্কা হয়েছিল তাঁর। সদা শত্রু-পরিবৃত, বিঘ্নিত-শান্তি পাণ্ডবের বর্ত্তমান অবস্থায় ভীম ও অর্জুন তাঁর বাম দক্ষিণ বাহুস্বরূপ। অর্জুন দূরে চলে গেলে তিনি কি শক্তিহীন হয়ে পড়বেন না ? স্বজন-বান্ধব পরিত্যাগ করে, দূরান্তরে, নিঃসহায় নির্বান্ধব অর্জুনের নিরুদ্দেশ্য পথে পথে ভ্রমণ কল্পনা করেও ব্যথিত হয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু তাঁকেও সঙ্গী হতে হবে এমন কথা তো চিন্তা করেন নি। দ্বাদশ বর্ষীয় নির্বাসন যাত্রার সঙ্গী হওয়ার অর্থ প্রকারান্তরে তাঁর নিজেরও নির্বাসন। তাঁরও গৃহ আছে, পুত্র-কন্যা আছে, আছেন প্রিয়তমা পত্নী ও পরিজনবর্গ। তাদের পরিত্যাগ করে দ্বাদশ বর্ষ দূর দেশান্তরে অরণ্য-পর্বতে ভ্রমণ।

তথাপি মুহূর্ত্ত মাত্রেই মনস্থির করেছিলেন তিনি। আপৎকালে সহায়তা করতে না পারলে কিসের বান্ধব ! রাজবংশের সেবক তিনি। প্রভুর সংকটকালে সেবকেরও কিছু কর্ত্তব্য থাকে। দুর্বহ হলেও সে কর্ত্তব্যভার বহন করতে হবে তাঁকে।

কুন্তীকে আশ্বস্ত করেছিলেন তিনি। বলেছিলেন—'আপনার অনুরোধ আমি আদেশবোধেই শিরোধার্য্য করলাম দেবি। আপনি নিশ্চিন্ত হন। আপনার এই পুত্র পরম শক্তিমান।' বাহুবলে আর্য্যাবর্ত্তের শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধররূপে খ্যাত হয়েছেন। তিনি স্বয়ং আত্মরক্ষা

করতে সমর্থ। কারও সাহায্যের তাঁর প্রয়োজন নেই। তথাপি এ যাত্রায় আমি তাঁর সঙ্গী হবো। আমার পরিবার-পরিজন আপনার রক্ষণে নিরাপদ থাকবে বলে মনে করি। দ্বাদশ বর্ষ অন্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে তাদের মঙ্গল দর্শন করলেই আমি ধন্য হবো।

—'তোমার পরিবার আমার নিজ পরিবারের মতই সুরক্ষিত থাকবে পুরুধান। মহাবীর ভীম ও নকুল সহদেব সর্বদা সতর্ক হয়ে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। তুমি আমাকে এক অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করলে বৎস। আশীর্বাদ করি তুমি শ্রেয়ঃ লাভ কর। তোমার পরলোকগত পিতা যেমন স্বর্গত মহারাজ পাণ্ডুকে রক্ষা করতেন, তেমনি ভাবেই তাঁর পুত্রকে তুমি রক্ষা কর। সেই দূর বিদেশে অনেক গ্রাম, নগরী, শ্বাপদ তথা নিশাচর অধ্যুষিত অরণ্য-পর্বতে তাঁর শুভাশুভের সকল দায় আমি তোমারই উপর সমর্পণ করলাম।'

অনুরোধ করেছেন কুন্তী। আদেশও করতে পারতেন. প্রভু কিংবা প্রভুকুলের সকল আদেশ মান্য করতে তিনি বাধ্য। কিন্তু কুন্তী কখনই আদেশ করেন না। দাসদাসী, সেবক কিংবা পরিজনবর্গ— কারও উপরেই তাঁর ইচ্ছা কখনও আরোপ করেন না তিনি। তাঁর আদেশ নির্দেশ এমন অনুরোধের আকারেই ব্যক্ত হয় সর্বদা। আদিষ্টের মূল্য বা মর্য্যাদার কিছুমাত্র হানি না ঘটিয়েও আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়ে নিতে পারেন কুন্তী।

কুন্তীকে শ্রদ্ধা করেন পুরুধান। স্বর্গত রাজার বিধবা পত্নী বোধে মাত্র নয়, শ্রদ্ধা করেন তাঁর লোকাতীত চরিত্রগুণের জন্যও। অসাধারণ ধৃতি, অপরিসীম ধৈর্য্য এবং দুঃসহতম দুঃখভার নীরবে বহন করবার এক আশ্চর্য্য শক্তি তাঁর মধ্যে বর্তমান। পুরুধান সেই শক্তিকে বোঝেন। অন্য আরও শত শত ক্ষত্রিয় কুল-কামিনীদের মধ্যে তাঁর সেই পৃথক সত্তাকে অনুভবও করতে পারেন তিনি।

কেন যেন তাঁর মনে হয় কুন্তী তাঁর উপযুক্ত মর্য্যাদা কখনই প্রাপ্ত

হন নি শ্বশুরকুল থেকে। যদু বংশজাত শূরের কন্যা, যদুকুলে জন্মগ্রহণ করেও পালিতা হয়েছিলেন ভোজরাজ কুন্তী ভোজের গৃহে। পিতা শূর অঙ্গীকার করেছিলেন তাঁর প্রথম সন্তান বন্ধু কুন্তী ভোজকে উপহার দেবেন। কুন্তী তাঁর প্রথম সন্তান। অঙ্গীকারমত জন্মের অব্যবহিত পরেই কন্যাকে বন্ধুর হাতে অর্পণ করেছিলেন শূর।

বিস্ময় বোধ করেন পুরুধান, বেদনাও। পুত্রকন্যা কি কোনও সামগ্রী? ভূমি, স্বর্ণ কিংবা ধেনুর মত সন্তানও যে উপহার দেওয়া যায় একথা তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন না। বন্ধুপ্রীতি কত প্রবল—মৌখিক অঙ্গীকার কত মূল্যবান—যে বিবাহিত জীবনের প্রথম শুভ ফল আপন আত্মজাকেও পরিত্যাগ কবা যায় অবলীলাক্রমে!

অথবা—হয়তো ভ্রান্তি তাঁরই। গাভী, স্বর্ণ ও অপরাপর বিত্তের মত জায়া তথা অপত্যও তো গৃহস্বামীর সম্পত্তি। তাদের দান বা উপহার দিতে বাধা কোথায়? শূরের মহত্ত্বই প্রশংসিত, তাঁর অপত্য স্নেহ সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নের অবকাশ নেই।

ভোজরাজপুত্রী কুমারী কুন্তীর স্বয়ম্বরবার্ত্তা জ্ঞাত হয়ে পাণ্ডু গিযেছিলেন সেই সভায়। কুন্তী তাঁকে বরণ করেছিলেন এবং দিব্য বিভাময়ী এই নারীকে একেবারে বিবাহ করেই প্রত্যাবর্ত্তন করেছিলেন পাণ্ডু।

কুরুজ্যেষ্ঠরা সম্ভবতঃ কিছু অসন্তুষ্ট হয়ে থাকবেন এই ব্যাপারে। কারণ তাঁদের বংশের বিবাহবিধি সেই প্রথম লঙ্ঘিত হ'ল। কুরুকুলের নিয়ম পিতৃগৃহ থেকে কন্যা এনে বিবাহ-ব্যাপার সম্পন্ন হয় হস্তিনায়। এক্ষেত্রে তা হয়নি। বিবাহ কুন্তীর পিতৃগৃহেই হয়েছিল। কোনও কৌরবপ্রধান উপস্থিত ছিলেন না সেখানে, তাঁদের সম্মতি কিংবা আশীর্ব্বাদ গৃহীত হয় নি। ভরতকুলের কুলপ্রথা তো পাণ্ডু জানতেন। তথাপি কেন এই আচরণ করেছিলেন তিনি? কুন্তীকে দেখে কি নিতান্তই মুগ্ধ হয়েছিলেন—এবং অনুমতির অপেক্ষা করলে কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হতে পারে বলে বোধ হয়েছিল তাঁর?

বিঘ্ন উপস্থিত হবার আশঙ্কা ছিল। যাদবেরা কুলীন ক্ষত্রিয়রূপে স্বীকৃত নন ভারতের ক্ষত্রিয়সমাজে। তাঁরা অন্তজ জাতির শাসক এবং নিজেরা অন্তজ না হলেও উচ্চতর বলে গণ্য হন না। কারণ যদু বংশের আদি পুরুষ যদুকে পরিত্যাগ করেছিলেন তাঁর পিতা যযাতি। কেন করেছিলেন—সে বিষয়ে অস্পষ্ট এক কাহিনী প্রচলিত আছে লোকসমাজে। বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত যযাতি পুত্রের যৌবন প্রার্থনা করেছিলেন। যদু সম্মত হন নি, প্রত্যাখ্যান করেছিলেন পিতার প্রার্থনা। সেই অপরাধে পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত, অভিশপ্ত এবং রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত হয়েছিলেন তিনি।

পুরুষান জানেন না এই কাহিনী কতদূর সত্য। যদুর পরিত্যক্ত হবার অন্য কোনও কারণ ছিল কিনা তাও জানা নেই তাঁর। প্রাকৃতিক নিয়মে জীবদেহে সঞ্চারিত হয় যে জরা ও যৌবন—সেই অবস্থার বিনিময় কিভাবে সম্ভব তাও বুঝতে পারেন না তিনি। তথাপি যেহেতু বহুকাল যাবৎ অনেক প্রাচীন ও প্রাজ্ঞ ভাট বা সূতমুখে প্রচারিত আছে এই কাহিনী—তাই বিশ্বাস করা কর্তব্য বলে মনে করে অধিকাংশ মানুষ— তিনিও।

সেই যদুবংশের কন্যা—অতএব কৌরব সংসারে কুলীন কন্যার মর্য্যাদা কোনদিনই লাভ করতে পারেন নি কুন্তী। এবং যদিও পাণ্ডু এক পত্নীতেই সন্তুষ্ট ছিলেন, পারিবারিক প্রথামত তাঁর আরও এক বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন ভীষ্ম। মদ্ররাজ শল্যের ভগিনী মাদ্রীকে কন্যাপণ দিয়ে ক্রয় করে আনা হয়েছিল। বিবাহ হয়েছিল হস্তিনায়।

অনেকেই বুঝতে পারেন না ভ্রাতুষ্পুত্রদের জন্য বধূ সংগ্রহ করতে গান্ধার ও মদ্রদেশে কেন যেতে হয়েছিল ভীষ্মকে? আর্য্য ভারতে অধার্মিক ও কদাচারী বলে অখ্যাতি আছে গান্ধারক ও মদ্রকদের। বীর্য্যশুল্কে কন্যাগ্রহণ ক্ষত্রিয়ের রীতি, কিন্তু স্বর্ণ শুল্ক দিয়ে ভরতবংশ বধূ ক্রয় করেছে কবে? হস্তিনার প্রজারা বিস্মিত হয়েছিল। রাজবংশের ক্রিয়া-কলাপের সমালোচনা প্রকাশ্যে কখনই হয় না, কিন্তু গোপন-

আলোচনা ছিল। কুরুকুলে কুলীন বধূ আর পাওয়া যাবে না—এমন আশঙ্কাও করেছিল অনেকে।

কিন্তু পুরুধান অনুমান করতে পারেন কেন ভীষ্ম এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁরা—সারথীরা রাজপরিবারের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। পারিবারিক কোনও কার্য্যকারণই তাঁদের কাছে গোপন থাকে না। পাণ্ডুর কুন্তী-গ্রহণেই কুলভঙ্গ হয়েছিল এঁদের। এরপরে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের জন্য উচ্চকুলজাতা কন্যা সংগ্রহ করতে হলে বলপ্রয়োগের পথ অবলম্বন করতে হয়। একবার বিচিত্রবীর্য্যের জন্য কাশীরাজপুত্রীদের হরণ করেই যথেষ্ট বিব্রত হয়েছিলেন ভীষ্ম। কাশী নরেশের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা ভীষ্মকে পতিত্বে বরণ করবার জন্য পণ করে বসেছিলেন। চিরকুমার ভীষ্ম—নারী জাতির চিত্ত ও চরিত্র সম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞ। ভ্রাতার জন্য হৃতা কন্যা যে তাঁকেই কামনা করতে পারেন—এমন আশঙ্কা তাঁর কল্পনায়ও স্থান পায়নি। আজীবন ব্রহ্মচর্য-ব্রতধারী ভীষ্ম অম্বাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং অনুরক্তা নারীকে সেই অবমাননার প্রতিক্রিয়া বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। আপন অস্ত্রগুরু পরশুরামের সঙ্গে এক অবাঞ্ছিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল তাঁকে। বহু কষ্টেই সে উপদ্রব থেকে মুক্তিলাভ করতে পেরেছিলেন তিনি।

অতঃপর বীর্য্যশুল্কে কন্যাগ্রহণে বিতৃষ্ণা আসাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। স্বাভাবিক কারণেই কুলভঙ্গ স্বীকার করেছিলেন। পরিবর্ত্তে প্রাপ্ত হতে চেয়েছিলেন গুণবতী উত্তমা নারীরত্ন।

তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। গান্ধারী যুগশ্রেষ্ঠা মনস্বিনী। মাদ্রীর সদ্‌গুণও প্রমাণিত।

জন্মাবধি পাণ্ডু ভগ্নস্বাস্থ্য। তাঁর জ্যোতিঃহীন পাণ্ডুবর্ণ মুখ ও অশক্ত দেহপটেই পাঠ করা যেত সেই স্বাস্থ্যহীনতার সংবাদ। জননী কৌশল্যার যত্ন, পৌরজনের সেবা কিংবা অভিজ্ঞ রাজবৈদ্যদের নিপুণ চিকিৎসাও সুস্থ করতে পারেনি তাঁকে। কি অভিশপ্ত এই রাজবংশ!—পুরুধান

চিন্তা করেন মাঝে মাঝে—বংশানুক্রমে ব্যাধি এখানে তার আধিপত্য বিস্তার করে আছে। পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্রের পিতা বিচিত্রবীর্য যক্ষ্মাগ্রস্ত হয়েছিলেন। কেউ কেউ বলে বিবাহের পর একাদিক্রমিক পত্নী সহবাসই নাকি তাঁর ব্যাধির কারণ। বিশ্বাস হয় না। নারী সম্বন্ধে রাজারা আর সংযমে বিশ্বাসী করে? বিচিত্রবীর্য্য না হয় কিছু আধিক্যই করেছিলেন। মনে হয়, অন্য কোনও সূত্রে কালব্যাধি আক্রমণ করেছিল তাঁকে। অকালে কালগ্রস্ত হয়েই সে অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ করলেন তিনি।

ঈশ্বর জানেন কাশীরাজের দুই কন্যা—বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীরাও শোণিতে বহন করছেন কোন অভিশাপের বীজ—অন্যথায় একটিও সুস্থ শিশুর জন্ম দিতে কেন পারলেন না তাঁরা? রাজকুলে পুত্র বড়ই প্রয়োজন। রাজ্য অরাজক, কুল উৎসন্ন হয় উত্তরাধিকারবিহীন হলে। নিঃসন্তান রাজা বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুর পর রাজমাতা সত্যবতী তাই বিধবা পুত্রবধূদের গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্য নিয়োগ করেছিলেন তাঁর কুমারীকালের পুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসকে। কিন্তু ঋষিদত্ত বীজও রক্তধারায় প্রবাহিত সেই ব্যাধির অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে পারেনি বংশকে। জ্যেষ্ঠা অম্বিকার পুত্র ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ, কনিষ্ঠা কৌশল্যা প্রসব করেছেন চিররুগ্ন পাণ্ডুরোগগ্রস্ত পাণ্ডুকে।

রাজধর্মের বিধি অনুযায়ী অন্ধের রাজ্যাধিকার থাকে না। ধৃতরাষ্ট্র তাই রাজপদ লাভ করতে পারেন নি। সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন কনিষ্ঠ পাণ্ডু। কিন্তু অন্ধ, অসহায়, চিরকাল পরনির্ভর বৈমাত্রেয় অগ্রজের প্রতি তাঁর মমতা ও মর্য্যাদাবোধ চির জাগরূক ছিল। আপন সিংহাসনে জ্যেষ্ঠকেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। রাজ্যের পরিচালনা-ব্যাপারে প্রধানতঃ ভীষ্মের মতাবলম্বী হলেও ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ-নির্দেশের প্রতিবাদ কখনও করেন নি।

কেন করেন নি?

প্রবল এক দীর্ঘশ্বাসে উন্মথিত হলেন পুরুধান।—রাজ্যের ন্যায্য

ভাগ তখনই কেন নির্দ্ধারণ করে নেন নি পাণ্ডু। তাহলে তো এতকাল পরে এই অনর্থকারী ভ্রাতৃবৈর উপস্থিত হত না। দুস্তর দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হতে হত না তাঁর প্রিয় পত্নী ও শিশুপুত্রদের।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি নির্ভরশীল ছিলেন পাণ্ডু। দ্বিতীয়তঃ রাজ্য-বিস্তারেরও প্রয়োজন হয়েছিল। পররাজ্য লুণ্ঠন ভিন্ন সম্পদ-বর্দ্ধনের অন্য কোনও উপায় তো রাজারা শিক্ষা করেন না।

অথচ ভীষ্মের তরুণ বয়সের পর সাম্রাজ্যের সীমা কিংবা রাজকোষের সমৃদ্ধি সাধনের কোনও চেষ্টা এ বংশে আর হয় নি। বৃদ্ধ বয়সে নূতন করে অস্ত্রধারণ অথবা পররাজ্য আগ্রাসনের প্রবৃত্তি ভীষ্মেরও আর ছিল না।

তাঁকে দোষারোপ করা যায় না। ভরতবংশে যত পুণ্যশ্লোক পুত্র জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে ভীষ্মের তুল্য আর কে?—আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিতে আর্দ্র হয়ে উঠল পুরুধানের মুখ।

কি না করেছেন ভীষ্ম? সসাগরা ধরণীর চক্রবর্ত্তী সম্রাট হবার যোগ্যতা তাঁর—কিন্তু জীবনে তিনি সন্ন্যাসী—আজীবন সুকঠোর এক ব্রত বহন করছেন নীরবে। অখণ্ড কৌরব সাম্রাজ্য খণ্ড হোক—খণ্ডিত হোক ঐক্যবদ্ধ শক্তি ও সম্পদ—এ তিনি ইচ্ছা করেন না। সে দুর্দৈব এড়াতে প্রযত্নের অন্ত নেই তাঁর।

কি না করেছেন তিনি?

পিতার বিবাহ দিয়েছেন। নিজে অবলম্বন করেছেন ব্রহ্মচর্য। পিতৃহীন শিশু দুই অনুজকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন জীবনে। সেই ভ্রাতাদের মৃত্যু হয়েছে তাঁরই চক্ষের সম্মুখে। শোকার্ত্ত চিত্ত সম্বরণ করে এক অন্ধ ও এক রুগ্ন ভ্রাতুষ্পুত্রকে তুলে নিয়েছেন বুকে। তাদেরও পালন এবং প্রতিষ্ঠার দুর্বহ দায়ভার তাঁরই স্কন্ধে ন্যস্ত হয়েছে। এখন তিনি বৃদ্ধ—হয়তো বা ক্লান্তও। এখন তাঁর পৌত্ররা প্রবল।

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা স্বেচ্ছাচারী ও মদমত্ত। ভীষ্মকে তারা অবজ্ঞা করে। তথাপি—অবমানিত হয়েও অদ্যাপি কুরুকুলের মঙ্গলচেষ্টাই করছেন ভীষ্ম। চিরকাল তাই তো করে এসেছেন তিনি।

মাদ্রীর সঙ্গে বিবাহের পর মাত্র ত্রয়োদশ দিন গৃহবাস করেছিলেন পাণ্ডু। নববিবাহিতা যুবতী পত্নীর আকর্ষণও নিরস্ত করতে পারেনি তাঁকে। শূন্যপ্রায় রাজকোষের দৈন্যদশা অনেক দিনই চিন্তার কারণ হয়েছিল তাঁর। সম্প্রতি তাঁদের উভয় ভ্রাতার বিবাহ উৎসবের বিপুল ব্যয় আরও প্রকট করে তুলেছিল সে শূন্যতাকে। অতএব পক্ষকাল পূর্ণ হবার পূর্বেই যুদ্ধযাত্রা করলেন তিনি। রাজ্যসীমা প্রসারিত হল, সম্পদও সংগৃহীত হল। কিন্তু রাহুগ্রস্ত হলেন পাণ্ডু নিজে। ভগ্ন-স্বাস্থ্য অশক্ত দেহ তাঁর—কষ্টকর এই দিগ্বিজয়ের ক্লেশ ও পরিশ্রম সহ্য করতে পারেনি। অবদমিত ব্যাধি প্রবল বিক্রমে আক্রমণ করল তাঁকে। হস্তিনায় প্রত্যাবর্তন করেই শয্যাশায়ী হলেন তিনি। রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বৈদ্যদের সর্বপ্রকার প্রযত্নও আরোগ্য করতে পারল না তাঁকে।

পুরুধান জানেন শারীরিক ব্যাধির সঙ্গে সঙ্গে দুরারোগ্য এক মানসিক অবসাদেও আদ্যন্ত আক্রান্ত ছিলেন তিনি। দীর্ঘ বিবাহিত জীবন যাপন করেও তাঁরা উভয় ভ্রাতা তখনও পর্যন্ত নিঃসন্তান। অপত্যহীন জীবনের শূন্যতার সঙ্গে কুল এবং রাজ্যের নিদারুণ উত্তরাধিকার চিন্তাও সর্বদা বিষণ্ণ করে রাখতো তাঁকে। অরাজক রাজ্য প্রজার কষ্ট এবং শত্রুর হর্ষের কারণ ঘটায়। কুলের ধ্বংস এবং প্রজাসাধারণের সেই শোচনীয় পরিণাম চিন্তায় নিয়ত জীর্ণ হচ্ছিলেন তিনি।

তারপর অকস্মাৎ একদিন অরণ্যবাসের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন পাণ্ডু। প্রাসাদ থেকে অবশ্য প্রচার করা হল মৃগয়ায় চলেছেন তিনি। কিন্তু প্রজারা তো অন্ধ নয়। সদাপ্রসন্ন, স্নেহ ও সরলতার প্রতিমূর্ত্তি তাদের এই প্রিয় নরপতিকে তো পূর্বেও দেখেছে তারা। পাণ্ডুর জীর্ণ দেহ ও নিরক্ত মুখাবয়বই প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিয়েছিল তাদের।

কুন্তী ও মাদ্রী সহ নিতান্ত দুঃখিত চিত্ত সেই রাজা যেদিন বিদায় নিলেন, হস্তিনার প্রজাকুলে সেদিন হাহাকার।

কেন গিয়েছিলেন পাণ্ডু ?

গৃহের নিশ্চিন্ত বিশ্রাম, মাতার কল্যাণ দৃষ্টি, পৌরজনের সতত সতর্ক পরিচর্যা—সব পরিত্যাগ করে অরণ্যবাসের সঙ্কল্প কেন গ্রহণ করেছিলেন তিনি ? তিনি কি বুঝতে পেরেছিলেন ব্যাধি বশীভূত হচ্ছে না, বরং প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে প্রতিদিন। দুরন্ত মৃত্যু তিলে তিলে নিকটবর্ত্তী হচ্ছে। সময় সংক্ষেপ তাঁর।

জীবিত থাকবার প্রবল বাসনায় একবার কি শেষ চেষ্টা করতে চেয়েছিলেন ? রাজ্য-রাজধানী থেকে দূরে, নগরীর কর্ম কোলাহলের বাহিরে, নির্জনে—অরণ্যে, নির্মলা প্রকৃতির নিজস্ব শুশ্রূষায় সুস্থ হবার আশা করেছিলেন—প্রতিহত করতে চেয়েছিলেন শিয়রে সমাগত অবধারিত মৃত্যুকে ?

জানেন না। সে সব কিছুই জানা নেই তাঁর। তিনি তখনও অপ্রাপ্ত যৌবন। পুরুধানের পিতা নিযুক্ত ছিলেন পাণ্ডুর সারথ্যে। রাজার সঙ্গে তিনিও বন-প্রস্থান করলেন। রাজপরিবারের সঙ্গে জড়িত থাকে যে সেবকরা—তাদেরও জীবন আবর্ত্তিত হয় প্রভুকুলের সুখ-দুঃখ উত্থান-পতনেরই সঙ্গে সঙ্গে।

চিরতরেই গেলেন পাণ্ডু। ভরত বংশের সত্য ও সচ্চরিত্রতার শেষ শিখাটি নির্বাপিত হল। কিছুকাল পরে সানুচর সারথী একাকী ফিরে এলেন। জানা গেল মধ্য যৌবনেই বাণপ্রস্থ গ্রহণ করেছেন রাজা। অপত্য-লাভের আশা আর নেই। বনবাসকালে এক ঋষির অভিশাপে পত্নী-সহবাস নিষিদ্ধ হয়েছে তাঁর।

ঋষিশাপে অথবা ব্যাধির প্রকোপে সে তর্ক বৃথা। পাণ্ডু আর ফিরে আসবেন না, এই মাত্র সত্য। অভাবিত এই পরিণামে ব্যথিত হল পরিজন। অবক্ষয়প্রাপ্ত বংশের অন্তিম বর্ত্তিকাটি হারিয়ে ভীষ্ম হলেন আর্ত্ত। বাহ্যতঃ কিছুই ব্যক্ত করলেন না তিনি। কিন্তু বার্দ্ধক্য-

জীর্ণ দেহ তাঁর কিঞ্চিত ন্যুব্জ হল, শুভ্র কেশ আরও শুক্ল এবং রেখাঙ্কিত সেই প্রাচীন ললাটে দেখা দিল অতিরিক্ত আরও কয়েকটি বলিরেখা।

দীর্ঘ—সুদীর্ঘকাল পরে—যখন তাঁদের প্রত্যাবর্ত্তনের কোনও আশাই আর নেই, বহুদূরে সহায়হীন নির্বান্ধব কোনও ঘোরারণ্যে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে বলেই যখন ধারণা করেছে মানুষ—তখন অকস্মাৎ একদিন পঞ্চশিশু বক্ষে ধরে কয়েকটি মাত্র বনচর রক্ষক সহ পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃতদেহ বহন করে হস্তিনায় আবির্ভূত হলেন কুন্তী।

নগরে সেদিন কি বিপুল উত্তেজনা। শত শত মানুষ ধাবিত হল তাঁদের দর্শন-লালসায়। রাজপথে জনারণ্য। আলোচনা সমালোচনায় জনতা মুখর। ধর্ম ও সমাজবিধির প্রশ্নে মানুষের নিষ্ঠুরতা সেদিন চরম সীমায় উপনীত। পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃতদেহ, কুন্তীর দীনদশা, মহা-শোকে অবসন্ন, পথশ্রান্তিতে বিবর্ণ বিশীর্ণ তাঁর মূর্ত্তি—কিছুই তাদের করুণা উদ্রেক করতে পারলো না। শতমুখে, সহস্র জিহ্বায়, সরবে উচ্চারিত তখন শুধু একটিমাত্র নিষ্ঠুর প্রশ্ন—ঋষিশাপে স্ত্রী-গমনে বঞ্চিত ছিলেন রাজা—এই পঞ্চপুত্রের জন্ম তাহলে সম্ভব হল কেমন করে?

সাহস ও সত্যবাদীতার পরীক্ষায় সেদিন সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন কুন্তী। সেই অসংখ্য প্রজা, অগণিত পুরবাসীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে অকুণ্ঠিতা অনবগুণ্ঠিতা, ভয়হীন স্পষ্টস্বরে স্বীকার করেছিলেন—এই শিশুরা পাণ্ডুর ঔরসজাত নয়। দেবতার আশীর্বাদে প্রাপ্ত তাঁর ও মাদ্রীর গর্ভ-জাত এরা ক্ষেত্রজ সন্তান। ইচ্ছা হলে কুরুবৃদ্ধরা এদের গ্রহণ করুন পাণ্ডুর বংশধর বলে।

তুষ্ণীভূত হয়ে সমস্ত হস্তিনা শ্রবণ করল সেই স্বীকারোক্তি। তার মধ্যে মিথ্যা ছিল না, কুন্তীর মধ্যে ছিল না গ্লানি বা অপরাধবোধের লেশমাত্র। সত্যের দীপ্তিতে দীপ্যমানা তিনি প্রতীক্ষা করছিলেন—হয়তো বা প্রস্তুতও ছিলেন অন্তরে-অন্তরে। হস্তিনার রাজ-প্রাসাদ এদের স্বীকার করে ভাল—না করে এদের হাত ধরে তিনি আবার ফিরে যাবেন সেই শতশৃঙ্গ পর্বতে। রাজ্য, রাজভোগ

প্রাসাদের বিলাস-বৈভব সব অর্থহীন। তাঁর কাছে একমাত্র সত্য তাঁর পুত্রেরা। তাদের জন্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য পদদলিত করতে তিনি প্রস্তুত।

কুন্তীর সেদিনের সেই মূর্ত্তিটি অদ্যাপি স্মরণ করতে পারেন পুরুধান। পদনখ থেকে কেশাগ্র পর্যন্ত সর্বাঙ্গে সর্বাবয়বে প্রদীপ্ত প্রজ্বলিত এক মাতৃমূর্ত্তি। বস্তুত 'মাতা কুন্তী' ভিন্ন আর কোনও রূপে বা পরিচয়ে তাঁকে যেন তিনি কল্পনাই করতে পারেন না।

অথবা—

অথবা এই বোধ হয় তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। সংসার কোনোদিন সুবিচার করেনি তাঁর প্রতি। শৈশবে পিতৃগৃহচ্যুত, মাতার সঙ্গ ও স্নেহ বঞ্চিত, পালিত হয়েছেন পরগৃহে। যৌবনে ভরতবংশীয় রাজ-চক্রবর্ত্তীর পরিণীতা হয়েও সুখ-শান্তি লাভ করতে পারেন নি। অদৃষ্ট প্রবঞ্চনা করেছে তাঁর সঙ্গে। চিররুগ্ন অক্ষম স্বামী না দিতে পেরেছেন নারীত্বের সম্ভোগ, না পূর্ণ করতে পেরেছেন মাতৃত্বের অভিলাষ। এই শিশুরা তাঁর স্বোপার্জ্জিত। তাঁর নিজস্ব চেষ্টা এবং উদ্যোগের ফল। এদের লাভ করবার জন্য চলিত ব্যবস্থা লঙ্ঘন করেছেন তিনি, চরাচরের সমস্ত ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা লঙ্ঘন করেই এদের রক্ষাও তিনি করবেন।

অনমনীয় সেই দৃঢ়তার সম্মুখে মাথা নত করেছিল মানুষ। পরাস্ত হয়েছিলেন কুরুবৃদ্ধরাও। বিশেষতঃ ভরত বংশে ক্ষেত্রজ সন্তান নূতন নয়, বর্ণসাংকর্য দোষও পূর্বেই ঘটেছে। স্বয়ং বিচিত্রবীর্য্য ছিলেন বর্ণসংকর। ক্ষত্রিয় রাজা শান্তনু আর ধীবর কন্যা সত্যবতীর সংসর্গে তাঁর জন্ম। পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রও ক্ষেত্রজ সন্তান। বংশধারার বিশুদ্ধতা অবশিষ্ট নেই আর। এই শিশুরা তাহলে পরিত্যক্ত হবে কোন যুক্তিতে?

অতএব কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডব আশ্রয় লাভ করলেন হস্তিনার রাজ-গৃহে। ভরত বংশের ইতিহাসে সংযোজিত হল এক নূতন অধ্যায়।

কিন্তু আশ্রয় আর সুখাশ্রয় সমার্থক হয় কদাচিত। কুন্তীর ভাগ্যেও তা

হয়নি। কারণ প্রাচীনেরা স্বীকার করলেও ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্যোধন কখনই স্বীকার করেন নি এই বালকদের পাণ্ডবত্ব। অন্ধ পিতার স্নেহ-দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শতভ্রাতা কৌরব ইতিমধ্যেই যথেষ্ট স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছিলেন। পুর-জ্যেষ্ঠদের হিতবাক্য বা সান্ত্বনাদ উপেক্ষা করবার মতো ঔদ্ধত্যও অর্জিত হয়েছিল তাঁদের। এতকাল দুর্যোধন জানতেন কুরুকুমারদের মধ্যে তিনিই জ্যেষ্ঠ, অতএব রাজপদ তাঁরই প্রাপ্য। কিন্তু এখন এতদিন পরে অগ্রজের অধিকার নিয়ে যুধিষ্ঠিরের অকস্মাৎ আবির্ভাব বিদ্বিষ্ট ও অসূয়া-পরায়ণ করে তুলেছিল তাঁকে।

ধৃতরাষ্ট্রেরও প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় ছিল। অন্ধত্বের কারণে তিনি যা পারেন নি দুর্যোধনের তা সাধ্য হবে, আপন অচরিতার্থতার গ্লানি অতি-ক্রম করবেন পুত্রের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে—এই ছিল তাঁর আশা। পাণ্ডবদের অভ্যুদয়ে সে আশার মূল উৎপাটিত হয়েছিল। বাহ্যতঃ কোনও বিদ্বেষ প্রকাশ না করলেও অন্তরে পাণ্ডুপুত্রদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না তিনি।

অনেকেই বিস্মিত হন এই চিন্তা করে যে, ভীষ্ম কেন কঠোর হস্তে শাসন করেন নি দুর্যোধনকে—কেন নিগ্রহ করেননি নিয়ত নীচতা পরায়ণ, ক্রুর, দুষ্ট বুদ্ধি দুঃশাসনাদি পৌত্রদের? তিনি কুরুকুলের অতিবৃদ্ধ, প্রবীণ, প্রাচীন এবং লোকমান্য গুরুজন। তিনি ইচ্ছা করলে কি নিবারণ করতে পারেন না এই ভ্রাতৃ-বিবাদ? যে শান্তনব ভীষ্ম শরাসন ধারণ করলে বসুমতী বিচলিতা হন, স্বর্গাধিপ মহেন্দ্র হন ভয়ত্রস্ত—দুর্যোধনের সাধ্য কি তাঁর আদেশ অগ্রাহ্য করে। কিন্তু অজ্ঞাত কোন কারণে ভীষ্ম কঠোর হতে পারেন নি কোনও দিন এবং দুর্যোধনের ঔদ্ধত্যও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে বিনা বাধায়। পাণ্ডবদের হস্তিনা প্রবেশের দিনটি থেকেই কৌরব ভ্রাতৃগণের স্থিরসিদ্ধান্ত—যেহেতু এঁরা পাণ্ডুর পুত্র নন, অতএব কৌরব সাম্রাজ্যের অংশ তাঁদের প্রাপ্য হতে পারে না।

মাঝে মাঝে পুরুধানের মনে হয়, অহংকারী বা ঈর্ষাপরায়ণ হলেও দুর্যোধনের এই যুক্তির মধ্যে সত্য কিছু আছে। প্রথমতঃ সত্য এই যে

এঁরা পাণ্ডুর ঔরসজাত নন। দ্বিতীয়তঃ, ধর্মমতে ক্ষেত্রজ সন্তান বিধি-বহির্ভূত না হলেও সে ব্যবস্থা গ্রহণ করবার পূর্বে পরিবারের জ্যেষ্ঠ তথা গুরুজনদের সম্মতি গ্রহণ করবার বিধান আছে। বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ ব্যাসকে নিয়োগ করবার পূর্বে রাজমাতা সত্যবতী ভীষ্মের অনুমতি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পাণ্ডু সে সব কিছুই করেন নি। স্বদেশ থেকে বহুদূরে সকলের অজ্ঞাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তিনি একা। তাঁর একক সিদ্ধান্ত পরিবারের সকলে মান্য করতে বাধ্য নন। তথাপি এঁরা যে স্বীকার করেছিলেন, সে নিতান্ত পাণ্ডুর প্রতি মমতা ও মর্য্যাদা বশতঃ। কিন্তু তাঁরা স্বীকার করেছেন বলেই দুর্যোধনকে তা মান্য করতে বাধ্য করা সম্ভব নয়। তাকে অনুরোধ উপরোধ করতে পারেন—শাসন করবেন কোন যুক্তিতে?

কুন্তী সর্বদা আতঙ্কে কাল যাপন করতেন। চক্রবর্ত্তী মহারাজ পাণ্ডুর পট্টমহিষী—একদা সম্রাজ্ঞীর শিরোভূষণ শোভা পেয়েছে যাঁর মাথায়—সেই দেবী কেবলমাত্র অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রত্যাশিনী হয়ে অতি দীনা দাসীর মতই পড়েছিলেন বিশাল কৌরব-সংসারের একপ্রান্তে। সর্বদাই তাঁর ভয়—বুঝি বা দুর্যোধন তাঁর পুত্রদের কোনও অনিষ্ট করে—বুঝি বা নিগৃহীত, নির্যাতিত কিংবা লাঞ্ছনা-ভাগী হয় তারা। পরিবারে বিদুর ভিন্ন কোনও হিতৈষী নেই। সদা সন্ত্রস্তা কুন্তী নীরবে সহ্য করতেন কৌরবদের সব অত্যাচার। দুর্ভাগ্যের ভার শান্তচিত্তে বহন করবার লোকদুর্লভ ক্ষমতা তাঁর ছিল। কখনও অভিযোগ করেননি, একটিও কাতরোক্তি উচ্চারিত হয়নি কণ্ঠে। অন্তহীন প্রতীক্ষায় অবিচল থেকেছেন শুধু এই আশায়—যে একদিন তাঁর এই পঞ্চপুত্র বর্দ্ধিত হবে। একদিন হৃতগৌরব ফিরে পাবেন তিনি। পক্ষীমাতা যেমন ভাবে শাবক রক্ষা করে, পুত্রদের রক্ষায় তেমনই সদা জাগ্রত থাকতেন কুন্তী। বস্তুতঃ সন্তান পালনের জন্য কোনও রাজবধূকে এত কষ্ট করতে ইতিপূর্বে আর কখনও দেখেন নি পুরুধান।

মাতৃচরিত্রের সেই ধৈর্য্য-ধৃতি আদি গুণগ্রাম পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান আছে। শৈশবের অরণ্যবাস কষ্টসহিষ্ণু ও কঠোর শ্রমে অভ্যস্ত করেছে তাঁদের। বনচারী যতি ও মহর্ষিদের শিক্ষায় মন মার্জিত। সাধারণ বন্য বালকদের সঙ্গে একত্রে লালিত হবার ফলে উচ্চনীচ-নিরপেক্ষ সমদৃষ্টি লাভ করতে পেরেছেন। রাজকুলের চিরাচরিত দম্ভ ও উন্নাসিকতা থেকে মুক্ত এই কুমাররা। হস্তিনার প্রজাকুলে অত্যন্ত প্রিয়।

অপর পক্ষে কৌরব ভ্রাতৃগণ প্রমত্ত ও রাজকীয় অহমিকায় আচ্ছন্ন গ্রস্ত। সাধারণ মানুষের সঙ্গে অন্তর-সম্পর্ক স্থাপন করতে তাঁরা ব্যর্থ।

বস্তুতঃ সত্য এই যে, ভারতের রাজন্যবর্গ প্রজাসাধারণের সুখ-দুঃখ থেকে সর্বথা-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন ইদানীং। তাঁরা বাস করেন তাঁদের বিলাসবহুল আড়ম্বরময় জীবনযাত্রার মধ্যে। সারা ভারত ব্যাপ্ত করে অনেক খণ্ড-বিচ্ছিন্ন রাজ্য, অসংখ্য রাজা, সংখ্যাতীত তাঁদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, পরিবার পরিজন, দাসদাসী পত্নী-উপপত্নী, নিয়ে বিশাল এক-একটি রাজ-সংসার। তাঁদের বিলাস বহুল জীবন যাত্রার যে ব্যয—কেবলমাত্র ষষ্ঠাংশ কর গ্রহণে তা নির্বাহ হতে পারে না। অতএব প্রজা শোষিত হচ্ছে। সুরা, নারী, দ্যূত এবং যুদ্ধ—এই চতুর্বিধ ব্যসনে তাঁরা আসক্ত, আর সেই আসক্তির মূল্য রাজ্যের শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষকেই পরিশোধ করতে হয়। এই যেখানে অবস্থা—সেখানে কোথাও যদি কোনও ব্যতিক্রম দেখা যায়, কোনও রাজবংশীয়ের মধ্যে যদি দেখা যায় সংযম, সদাচার ও সরলতার প্রকাশ, প্রজারা তাদের নিঃশর্ত্ত আনুগত্য সেখানেই সমর্পণ করবে। পাণ্ডবদের মধ্যে সে ব্যতিক্রম দেখা গেছে, কৌরবদের মধ্যে তা অনুপস্থিত। ফলে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই কুরুরাজ্যের প্রজা-সাধারণ আজ পাণ্ডুপুত্রদের অনুগত।

যুধিষ্ঠির তীক্ষ্ণধী। প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে বিলম্ব হয়নি

তাঁর। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সর্বদা সংযোগ রক্ষা করেন তিনি। তিনি বুঝেছেন পৈতৃক রাজ্যের ভাগ পেতে হলে প্রজাসাধারণের এই সমর্থন তাঁর প্রয়োজন। ধৃতরাষ্ট্র কিংবা দুর্যোধনাদি শতভ্রাতা কখনই স্বীকার করবেন না তাঁদের উত্তরাধিকার…

উত্তরাধিকার!

তীব্র বিদ্রূপে বঙ্কিম হল পুরুধানের অবরোষ্ঠ।

দুর্যোধন মনে করেন, যেহেতু এঁরা পাণ্ডব নন রাজ্যভাগ এঁদের প্রাপ্য নয়। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়—তাঁরা নিজেরা কৌরব তো? দুর্যোধন, দুঃশাসন ইত্যাদি এই শতভ্রাতা? এঁরা কি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র?

মহীয়সী গান্ধারীর সন্তানবতী হওয়ার রহস্য কে না জানে? ক্রমাগত দুইবৎসর কাল গর্ভধারণ করেছিলেন তিনি। সন্তান প্রসূত হয় নি। অবশেষে গর্ভ উন্মোচন করে এক মাংসপিণ্ড পাওয়া যায়। অতঃপর চিরাচরিত প্রথামত ঘটনাস্থলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের আর্বির্ভাব এবং উদ্ভব হল আরও এক চমৎকারী কাহিনীর। শতাধিক এক খণ্ডে বিভক্ত সেই মাংসপিণ্ড নাকি শতাধিক এক ঘৃত কুম্ভে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। তারও দুই বৎসর পরে এক-একটি কুম্ভ থেকে অবতীর্ণ হল এক-একটি শিশু। গান্ধারীর শতপুত্র ও এক কন্যা লাভের এই কাহিনী।

প্রকৃতিরও একটা নিয়ম আছে। আ-চরাচর ব্যাপ্ত বিশ্বজগত সেই নিয়মের সূত্রে গাঁথা। শিশুর মাতৃ-গর্ভবাসের দিন সংখ্যা নিরূপিত ও নির্দিষ্ট। সেদিন অতীত হলে ভূমিষ্ঠ তাকে হতেই হবে। একাদিক্রমে দুই বৎসর কাল সন্তান ধারণ করা কোনও নারীর সাধ্য নয়। ঘৃতকুম্ভে ভ্রূণ পারে না জীবিত থাকতে। সন্তান ধারণ এবং উৎপাদনের মধ্যে এত দীর্ঘ ব্যবধানের কথা কে শুনেছে কবে? দুই বৎসরের ধৃত-গর্ভ উন্মোচনের পর এক মাংসপিণ্ড প্রাপ্তির মধ্যে অভিজ্ঞ বৈদ্য ব্যাধিলক্ষণ পেতে পারেন—সন্তানলক্ষণ কদাচ নয়। পার্থিব দেহ ধারণ করতে হলে দেবতাদেরও মাতৃশরীর আশ্রয় করতে হয়।

পূর্ণব্রহ্ম অবতার রঘুপতি রামচন্দ্রকে তাঁর মাতা প্রসবই করেছিলেন, কোনও যজ্ঞবেদী কিংবা ঘৃত কলস থেকে উদ্ভূত হন নি তিনি। মানুষের জন্মের জন্য রক্তমাংসের মানবশরীর অবশ্য প্রয়োজন।

এই সব রাজন্য এবং ব্রাহ্মণেরা এক এক অদ্ভুত অপ্রাকৃত কাহিনী প্রচার করেন এবং আশা করেন যেহেতু প্রাসাদ থেকে প্রচারিত হয়েছে—অথবা কোনও আশ্রমপদ থেকে—অতএব অবশ্যই বিশ্বাস-যোগ্য হয়ে উঠবে তা। কি মনে করেন এঁরা সাধারণ মানুষকে? তারা অন্ধ, বধির, নির্বোধ এবং নিতান্তই মূর্খ? অসত্যকে অলঙ্কৃত করে প্রচার করলেই তার সত্যতা স্বীকার করে নেবে তারা?

অথবা—হয়তো সাধারণের সন্দেহ এবং বিশ্বাসহীনতার কথা তাঁরা নিজেরাও জানেন। জানেন বলেই প্রতিটি কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করে দেন এক-একটি উপকাহিনী। দেবতার বর, দৈবী কৃপা, কিংবা ঋষিদের অলৌকিক যোগক্ষেম—সব সন্দেহ, সব অবিশ্বাসের এই এক নির্ঘাৎ নিরসন তাঁদের।

যোগক্ষেম অস্বীকার করেন না পুরুধান। কিন্তু তার প্রকাশ এত উদ্ভট ও দুর্বোধ্য কেন?

আচার্য্য দ্রোণের জন্ম কলস থেকে, কৃপাচার্যের শরমুখে, পাঞ্চাল নরেশ দ্রুপদের পুত্রকন্যা আবির্ভূত হয়েছেন যজ্ঞাগ্নিতে। নবতম সংযোজন এই শতভ্রাতা কৌরব।

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের যোগবলে স্বাভাবিকভাবে সন্তানপ্রসবও তো করতে পারতেন গান্ধারী। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। জীববিজ্ঞানের তাবৎ তত্ত্ব নস্যাৎ করে ভূমণ্ডলে আবির্ভূত হয়েছেন এই ধৃতরাষ্ট্র নন্দনেরা। কে বিশ্বাস করবে এইসব অপ্রাকৃত কথা? গান্ধারীর এই পুত্রেরা দত্তক, গৃহীত, ক্রীত অথবা সংগৃহীত তা তিনি জানেন না, কিন্তু এঁরা যে গান্ধারীর গর্ভজাত নন—সে বিষয়ে হস্তিনার অধিকাংশ মানুষের মত তিনিও নিঃসন্দেহ।

হায়! অদ্ভুত এইসব ঘটনা, অলৌকিক আবির্ভাব বা অকৃপণ

দেব-দাক্ষিণ্য কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের শিরেই বর্ষিত হয় কেন? বৈশ্য এবং শূদ্রেরা কেন বঞ্চিত সে কৃপা থেকে। দেবতারা সমাজের নিম্নবর্গীয় এই দুই বর্ণের প্রতি এত অকরুণ কেন? তারাও তো স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত, দেব, ঋষি পিতৃগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল—তারাও তো মানুষ—

মানুষ!—ভ্রূ কুঞ্চিত হল পুরুধানের। অন্তর্নিহিত ক্ষোভ এবং পীড়া পরিস্ফুটিত হল মুখের অসংখ্য রেখায়।

মানুষ?—

তিনি নিজে শূদ্র—সূতজাতি। তিনি কি জানেন না মানুষের অধিকার কতখানি নির্দেশিত করা আছে তাঁদের জন্য? চাতুর্বর্ণে বিভাজিত এই সমাজে বর্ণানুযায়ী কর্মও নির্দিষ্ট। ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, উপাসনা ও প্রতিগ্রহ। ক্ষত্রিয়ের ক্ষতত্রাণ—অস্ত্রচালনা; বৈশ্যের কৃষি ও পশুপালন—আর শূদ্রের জন্য কেবলই এই উচ্চতর ত্রিবর্ণের সেবা। জন্মসূত্রে শূদ্রজাতি দাস। সমাজের অন্য কোনও সম্মানজনক বৃত্তিতে তাদের অধিকার নেই। নেই কোনও সম্পত্তিরও অধিকার। এমন কি দাসের পত্নী ও অপত্যের উপরেও প্রভুর অধিকার স্বীকৃত। প্রজ্ঞাবান ঋষি এবং সনাতন ধর্মে অনুরক্ত ক্ষত্রিয় সমাজ সম্মিলিত হয়ে স্থাপন করেছেন এই বিধি। এই নাকি বেদের বিধান।

বেদের বিধান?

হতাশ একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন পুরুধান।

জানেন না। তাঁর জানা নেই। কেউ জানে না।

পরীক্ষা করে দেখারও কোন সুযোগ নেই। কারণ শূদ্রের বেদপাঠ নিষেধ। শ্রবণেও বাধা আছে, কোনও ব্রাহ্মণ কোনও শূদ্রের সম্মুখে বেদপাঠ করেন না কখনও।

সাম্প্রতিক কালে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস অবশ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম। শূদ্রানীর রক্তধারা শরীরে বহন করেও তিনি ঋষি হয়েছেন, এক বেদ চতুর্বেদে বিভক্ত করে খ্যাত হয়েছেন বেদব্যাস নামে। অনধিকৃত এই

কর্মে অধিকার লাভ করবার মত পর্য্যাপ্ত পৃষ্ঠবল তাঁর ছিল। তাঁর মাতা শূদ্রানী হলেও পিতা প্রখ্যাত ঋষি পরাশর। ব্রাহ্মণ-শাসিত এই সমাজে মনুর পরেই পরাশরের প্রভাব স্বীকৃত। অতএব প্রথা-নিষিদ্ধ হলেও পুত্রকে বেদাধিকার দিতে সমর্থ হয়েছেন তিনি।

বেদনা বোধ করেন পুরুধান। মানুষের কি মূল্য আছে এই জগতে? মূল্যবান শুধু কুল, বংশমর্য্যাদা—রক্তধারা। উচ্চকুলে জন্ম যাঁর তিনিই শ্রেষ্ঠ। মমত্ব মানবিকতা বিসর্জন দিয়ে দুর্বলকে পীড়ন করছেন তাঁরা। হিংসাকে দিয়েছেন ধর্মের অভিধা। তাঁদের সেই লোভ ও হিংসানলে ইন্ধন প্রদান করতে ব্রাহ্মণরাও এখন অগ্রসর। তপ ও স্বাধ্যায় পরিত্যাগ করে ক্ষাত্রবৃত্তি ধারণ করছেন তাঁরা। উদাহরণ ভারদ্বাজ দ্রোণ, উদাহরণ ভারতের শ্রেষ্ঠ যুদ্ধ-বিশেষজ্ঞ জামদগ্ন-পরশুরাম। শুধু যুদ্ধই করছেন না তাঁরা, নিত্য নব নব মারণাস্ত্রও আবিষ্কার করেছেন। পলকে প্রলয় সৃজনক্ষম অস্ত্ররাজি নাকি তাঁদেব আয়ত্ত। শিষ্যদের—প্রধানতঃ ক্ষত্রিয় শিষ্যদের, যাঁরা তাঁদের পর্য্যাপ্ত বৃত্তি ও স্বর্ণ দিয়ে থাকেন—তাঁদের হাতে এই সব অস্ত্র তুলে দিচ্ছেন আচার্য্যরা। এই দাক্ষিণ্যের ফল যে কত ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে সে কথা তাঁরা চিন্তা করেন না!

পুরুধান কিছুতেই বুঝতে পারেন না; এই সব ব্রাহ্মণ-সমাজের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও বিদ্বানের স্বীকৃতি লাভ করে ঋষিপদে বৃত হয়েছেন যাঁরা—মানুষের কল্যাণ চিন্তা পরিত্যাগ করে ধ্বংসব্রত অবলম্বন করেছেন তাঁরা কেন? মদমত্ত এবং অনাচারী জেনেও ক্ষত্রিয়দের হাতে ভয়ঙ্কর সংহার অস্ত্র তুলে দিচ্ছেন কেন তাঁরা। এর পরেও কি সত্য, প্রেম, অহিংসার বাণী বলবেন তাঁরা—ব্রাহ্মণ হয়েও যিনি অস্ত্রধারণ করেন তিনি কি করে দাবি করতে পারেন অটুট আছে তাঁর স্বধর্ম!

এবং—এইভাবেই—এক এক স্থানে বিশেষ বিশেষ যোদ্ধার কাছে কেন্দ্রীভূত হয়েছে অপরিমিত শক্তি। একদিন না একদিন সে শক্তির

বিস্ফোরণ ঘটবেই। সমগ্র ভারতভূমিই হয় তো ধ্বংস হয়ে যাবে সে অভিঘাতের ফলে। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা না হয়েও সম্ভাব্য তেমন এক মহাযুদ্ধের আভাস যেন অন্তরে অনুভব করেন পুরুধান। শিহরিত হন মহাভারতের মহাশ্মশানে বিলুণ্ঠিত ভারতাত্মার হাহাকার কল্পনা করে।

সাম্প্রতিক কালে সেই আশঙ্কা—অস্পষ্ট সেই আতঙ্কবোধ যেন আরও ঘনীভূত হয়েছে দ্বারকাধীশ বসুদেবনন্দন বাসুদেব কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করে।

প্রাবৃট মেঘের মত দীপ্যমান ঘন-কান্তি এই অদ্ভুত পুরুষকে তিনি পূর্বে কখনও দেখেন নি শুনেছেন পাণ্ডবজননী পৃথার ইনি ভ্রাতুষ্পুত্র। সম্প্রতি বিশেষ হিতৈষী হয়েছেন পাণ্ডবদের।

কিন্তু এতদিন কোথায় ছিলেন ইনি? পঞ্চপুত্র বক্ষে নিয়ে পথে পর্বতে ভ্রমণ করেছেন কুন্তী. অসহ্য অবমাননা সহ্য করে বাস করেছেন শ্বশুরালয়ে বহু দুঃখ ও সংকট অতিক্রম করে বহুকষ্টে পালন করেছেন পুত্রদের। বিষপ্রয়োগে ভীম মৃতপ্রায় হয়েছিলেন বারণাবতে জতুগৃহে কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডবকে জীবন্ত দগ্ধ করবার ব্যবস্থা করেছিলেন দুর্যোধন। সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলির কথা চিন্তা করে অদ্যাপিও শিহরিত হন পুরুধান। বহু কষ্টে, বহু প্রচেষ্টায়. পুরুধানের মত কয়েকজন চিরবিশ্বস্ত সেবকের সাহায্য মাত্র অবলম্বন করে তাঁদের প্রাণরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন পাণ্ডবদের চির বান্ধব বিদুর।

তারপরেও দীর্ঘকাল আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে তাঁদের। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আশ্রয়বিহীন রাজপুত্ররা ভিক্ষাপাত্র তুলে নিয়েছেন হাতে। একদা ভারতসম্রাজ্ঞী কুন্তী জীবন ধারণ করেছেন সেই ভিক্ষার অন্নে।

তখন কোথায় ছিলেন এঁরা—এই বাসুদেব ও বলরাম? বৃষ্ণি, ভোজ ও অন্ধক বংশীয় এই বীরগণ?

কুন্তীর ভ্রাতা দ্বারকাধীশ বসুদেবই বা কেন সন্ধান করেন নি

ভগিনীর? আপৎকালে পরিবারের কন্যা পিতা বা ভ্রাতার গৃহেই তো আশ্রয় পায়।

—না, এই সব প্রশ্ন কৃষ্ণ বলরাম বা পাণ্ডবদের সমক্ষে উত্থাপন করতে পারেন না তিনি। শত হলেও রাম-কৃষ্ণ তাঁদের ভ্রাতা—কুটুম্ব। তিনি দাস—দাসই আছেন। দাসের কি অধিকার আছে আত্মীয়জনেব আচরণ সমালোচনা করবার!

তথাপি অকস্মাৎ আবির্ভূত এই যাদবদের দেখে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করেন তিনি। কি অদ্ভুত আচার-আচরণ এঁদের। জীবনে অনেক রথীর রথচালনা করেছেন পুরুধান। ব্যক্তিগত বহু-বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্রও দেখেছেন। কিন্তু সমগ্র একখানি হলকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে কখনও কাউকে দেখেন নি। কৃষ্ণাগ্রজ বলরাম তাই করেন। মহাভার, মহাকায় একখানি হল সর্বদা স্কন্ধে বহন করেন, এবং তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে তাঁর ক্রোধ উদ্রীক্ত হলেই সেই লাঙ্গলের ফলামুখে এই পাপ পৃথিবী উৎপাটিত করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবার শুভ সঙ্কল্প ঘোষণা করেন।

আশ্চর্য্যের কথা এই যে—পৃথিবী যদি উৎপাটিতই হয়—এবং সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত—তাহলে তাঁর সাধের দ্বারাবতী এবং অগণিত পরিজন-সহ স্বয়ং তিনি কোথায় থাকবেন সে বিষয়ে কিন্তু বিন্দুমাত্র উদ্বেগ দেখা যায় না তাঁর মধ্যে।

তথাপি বলরাম সহজবোধ্য। তাঁর বিপুল শক্তি, ক্ষণে ক্ষণে উদ্রীক্ত অকারণ কিংবা সকারণ ক্রোধ, স্ব-সৃষ্ট বিচিত্র হলায়ুধ সহ প্রভাতী সূর্য কিরণের মতই তিনি স্পষ্ট।

কিন্তু এই কৃষ্ণ…!

আপাদমস্তকে রহস্যাবৃত এই প্রহেলিকা-পুরুষকে একেবারেই বুঝতে পারেন না পুরুধান। কৌরব কিংবা পাণ্ডবদের কেউ কখনও পূর্বে দেখেনি তাঁকে। পাঞ্চালীর স্বয়ম্বর সভায় প্রথম তাঁর আবির্ভাব। পাণ্ডবদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ও সেখানেই।

পুরুধান শুনেছেন রামকৃষ্ণের অতীত জীবনও সুখময় নয়। মথুরাধিপ উগ্রসেন-সুত কংস তাঁদের মাতুল। কৃষ্ণজননী দেবকীর বিবাহ সভায় নাকি এক দৈববাণী হয়েছিল দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান কংসহন্তা হবে। উল্লাস-তরঙ্গিত উৎসব প্রাঙ্গণে শ্মশানের নীরবতা নেমে আসে তৎক্ষণাৎ। সব উৎসব বন্ধ করে কংস তখনি কারারুদ্ধ করেন ভগিনী ও ভগিনীপতি যদু বংশীয় বসুদেবকে। বসুদেব সহচর যাদবরা ভীরু ও অপদার্থ। ইতস্ততঃ পলায়ন করে নিজপ্রাণ রক্ষা করেছিল তারা, বসুদেব ও দেবকীকে উদ্ধারের কোনও চেষ্টাই করেনি।

তারপর সে এক অমানুষিক ইতিবৃত্ত। দীর্ঘকাল কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন দম্পতি। সেই অবস্থায় একটির পর একটি সন্তান প্রসব করেছেন দেবকী, আর জন্মমাত্রে পাথরে আছাড় মেরে তাদের হত্যা করেছেন কংস।

স্মরণমাত্রে আতঙ্কে বিতৃষ্ণায় রোমাঞ্চিত হন পুরুধান। একি পৈশাচিক নৃশংসতা! কোনও ভ্রাতা কি কখনও ভগিনীকে এত যন্ত্রণা দিতে পারে? দেবকীর সন্তান থেকেই যদি মৃত্যুভয়—স্বয়ং দেবকীকেই হত্যা করতে পারতেন কংস। তাঁকে জীবিত রেখে তিল তিল তুষানলে দগ্ধ করবার কারণ কি?

কারণ যাই হোক—এই পাপ—বৎসরের পর বৎসর এই শিশু-হত্যার কোনও প্রতিকার হয় নি। স্বয়ং বসুদেব বিনা বিদ্রোহে সহ্য করেছেন এই অত্যাচার বুদ্ধি-বর্জিত ইতর প্রাণীও শাবকরক্ষায় নখদন্ত বিস্তার করে। কিন্তু মানুষ—পুরুষ বসুদেব ততটুকু বিক্রমও প্রকাশ করেননি কখনও। বরং যখন একটির পর একটি শিশু নিহত হয়েছে, দেবকীর আকুল আর্তনাদে বিদীর্ণ হয়েছে কারাপ্রাচীরের পাষাণ—তখনও সেই কারাগারে, অত্যাচার আর নির্যাতনের সেই নরকে একটির পর একটি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তিনি। মরণধিক যন্ত্রণা থেকে যে পত্নীকে ত্রাণ করতে পারেন নি—সেই পত্নীতে নিয়মিত উপগত হতে দ্বিধাবোধ হয়নি তাঁর।

ধিক্ নির্লজ্জতা!—

তারপর কি হয়েছিল—বসুদেবের মত ক্লীব পুরুষও কেমন করে সাহস সঞ্চয় করেছিলেন কেউ জানে না। অথবা—

অথবা অত্যাচার যখন সহ্যশক্তির সীমা অতিক্রম করে, নিতান্ত জড় পদার্থেও বোধ হয় চেতনা সঞ্চার হয় তখন। কংসের মত দানবের কারাগারেও কিছু মানুষের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। কোনও রক্ষী কিংবা প্রহরীর হৃদয় হয়তো বিদ্রোহী হয়ে উঠে থাকবে অমানুষিক এই নিষ্ঠুরতায়। সম্ভবতঃ তাদেরই কারও সাহায্যে অষ্টম এবং শেষ এই পুত্রটিকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন বসুদেব।

শোনা যায়, ঝঞ্ঝামত্ত সে এক প্রলয় রাত্রি। মেঘাবৃত অন্ধকার ক্ষণে ক্ষণে বিদীর্ণ হচ্ছে বিদ্যুৎচমকে। মহাকালের অট্টহাসির মত ভয়ঙ্কর বজ্ররবে চরাচব বিকম্পিত। সেই অবস্থায়, সেই অন্ধকাব, ঝঞ্ঝা এবং করকাপাত বিঘ্নিত দীর্ঘপথ অতিক্রম করে গোকুলে বন্ধু নন্দ গোপের গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন বসুদেব। নন্দের পত্নী যশোমতীও সেদিন এক কন্যা প্রসব করেছেন। সুষুপ্তিমগ্ন সূতিকাগৃহে গোপনে প্রবেশ করে নিজ পুত্রকে যশোমতীর শয্যায় রেখে তাঁর কন্যাটিকে চুরি করেছিলেন তিনি, এবং তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্তন কবেছিলেন কংসকারায়। পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই কন্যাটিকে হত্যা করেছিল কংস।

বসুদেবের প্রথমা পত্নী রোহিনী ও জ্যেষ্ঠপুত্র বলরাম সহ কৃষ্ণ দীর্ঘকাল পালিত হয়েছেন গোপগৃহে। যমুনা তীরবর্তী এই গোপবসতি বহুদূর বৃন্দারণ্য পর্যন্ত বিস্তৃত। গোপজাতি সাহসী এবং শরণাগত বৎসল বলে খ্যাত। কংসের অধিকারে বাস করেও বসুদেবের পত্নী-পুত্রকে তারা যত্নের সঙ্গেই রক্ষণাবেক্ষণ করেছে। পরে প্রাপ্তযৌবনে শক্তি সঞ্চয় করে কংস বধ ও পিতামাতার দুর্গতিমোচন করেছেন তাঁরা। কিন্তু তথাপি স্বস্তিলাভ করতে পারেন নি। মগধরাজ জরাসন্ধের তাড়নায় দীর্ঘকাল তাড়িত হয়েছেন অরণ্যে পর্বতে। অবশেষে ভার্গব

পরশুরামের পরামর্শমত গিরি-সমুদ্র রক্ষিত দ্বারকাপুরীতে আশ্রয় গ্রহণ করে সুস্থিত হতে পেরেছেন এতদিনে।

ঘটনার ঘনঘটায় আচ্ছন্ন এই তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনকথা। এরপর অকস্মাৎ মহাভারতের তরঙ্গসঙ্কুল ঘটনাবর্তের কেন্দ্রস্থলে তাঁর আবির্ভাব, এবং আবির্ভাব মাত্রেই আপন অলঙ্ঘ্য ব্যক্তিত্ববলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন সর্ব কর্মকাণ্ডের অবিসম্বাদী নায়কত্বে।

ইতিমধ্যেই অনেক কথা ও কিংবদন্তী প্রচারিত হয়েছে তাঁর সম্বন্ধে তিনি নাকি ঐশী পুরুষ। দৈবাগত, দেবতা প্রেরিত। কারও মতে তিনি ঐন্দ্রজালিক। কটাক্ষে চরাচর বশীভূত করবার শক্তি আছে তাঁর।

তাই যদি হয়—পুরুধান চিন্তা করেন—তাই যদি হয়—সে শক্তি তিনি কৌরবদের উপরে প্রয়োগ করছেন না কেন? কেন প্রয়োগ করছেন না দুর্যোধন, শকুনি, কর্ণ প্রভৃতি পাণ্ডবদ্বেষীদের চিত্ত-পরিবর্ত্তনে! না—অন্ততঃ কর্ণকেও যদি তিনি স্ববশে আনতে পারতেন।

ধৃতরাষ্ট্রের সারথী অধিরথের বীর পুত্র—সূত-কুলগৌরব কর্ণ। পুরুধান পুত্রবৎ স্নেহ করেন তাকে। পরিতাপ শুধু এই যে সে কৌরব পক্ষে যুক্ত হয়েছে। দুর্যোধনের বল বহুগুণে বর্দ্ধিত হয়েছে মিত্ররূপে তাকে লাভ করে। কৃষ্ণ যদি অন্ততঃ কর্ণকেও নিবৃত্ত করতে পারতেন—!

কিন্তু তেমন কোনও চেষ্টা তাঁর নেই। বরং কথাচ্ছলে দুর্যোধনের দৌরাত্ম্য বর্ণনা করে মাঝে মাঝেই তিনি উত্তেজিত করেন শান্তিপ্রিয় পাণ্ডব ভ্রাতাদের। কৌরব পক্ষে যদি শকুনি—পাণ্ডবপক্ষে তবে কৃষ্ণ অবিরাম ইন্ধন প্রদান করে যাচ্ছেন নিহিত বৈরানলে। এর ফলে যদি কোনও যুদ্ধ সংঘটিত হয় কেবল কুরু ও পাণ্ডবদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না তা। ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত হবে ভারতের বৃহত্তর ক্ষত্রিয় সমাজে। শক্তিমত্ত, পরস্পরে সর্বদা দ্বেষপরায়ণ রাজন্যবর্গ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে বিনষ্ট হবেন।

কৃষ্ণ কি সেই ইচ্ছাই করেন? ক্ষত্রিয়দের তিনি ঘৃণা করেন। হাঁ—ঘৃণাই। কদাচিত কখনও কোনও উপলক্ষে শরৎকালীন সরোবরের মত শান্ত তাঁর চক্ষে চকিত যে বহ্নি বিচ্ছুরিত হতে লক্ষ্য করেছেন পুরুধান তার আর অন্য কোনও অর্থ হয় না।

কিন্তু কেন?

কে তিনি?

কেন এসেছেন—কি করছেন তিনি এখানে? কোনও সর্বনাশ কি আসন্ন!—কৃষ্ণকায় ধ্বংস-দেবতার মত সেই সর্বনাশের বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করতেই কি তাঁর অগ্রিম অভ্যুদয়?

এক প্রলয়রাত্রির ভয়ঙ্কর অন্ধকারে তাঁর জন্ম। জন্মমুহূর্তের সেই প্রলয়াভাস কি তিনি আজীবন বহন করছেন তাঁর অস্তিত্বে?

আশঙ্কা-কণ্টকিত দেহ সর্বাঙ্গে স্বেদ প্রবাহ—কম্পিত রুদ্ধস্বরে ইষ্টনাম উচ্চারণ করলেন পুরুধান। কেন এই অপচিন্তা!

হয়তো কিছুই নয়। হয়তো এ সবই তাঁর ভ্রম। ভীতিগ্রস্ত মস্তিষ্কের কল্পিত আতঙ্ক-বিকার। কেনই-বা কৃষ্ণ এমন অনিষ্টকারী কাণ্ড কামনা করবেন! কুন্তী তাঁর পিতৃস্বসা। পাণ্ডবেরা ভ্রাতা। তাঁদের অনিষ্ট হতে পারে এমন কিছুই কি করতে পারেন তিনি?

অবশ্যই ক্ষত্রিয়জাতির প্রতি কিছু বিতৃষ্ণা তাঁর থাকা সম্ভব। শৈশবে কংসের এবং যৌবনে জরাসন্ধের অত্যাচারে বহু দুঃখ ভোগ করেছেন। ন্যায্যতঃই তাদের দম্ভ, স্বার্থপরতা এবং উৎকট কুলগর্বের প্রতি বিরাগ পোষণ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়।

কুলগর্ব!...

হায়! আভিজাত্যগর্বী এই রাজবংশগুলির ভিত্তিমূল খনন করলে যত কলঙ্কিত কংকালের সন্ধান পাওয়া যাবে, কোনও অন্ত্যজ তা কল্পনাও করতে পারে না। তথাপি শূদ্ররাই হীনজাতি। আজন্ম দাসত্বই তাদের জন্য বেদনির্দিষ্ট ব্যবস্থা! হা—ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ সমাজ!

তাঁরা অন্ধ। পাথরে উৎকীর্ণ কালের লিখন তাঁরা পাঠ করতে পারেন না। শুনতে পান না সর্বজয়ী সময়ের রথচক্রধ্বনি। না হলে যে জাতির মধ্য থেকে আজ উদিত হয়েছেন বিদুরের মত বিজ্ঞ, ব্যাসের মত জ্ঞানী এবং একলব্যের মত মহাবীর—সে জাতিকে তাঁরা কেবল বঞ্চনাই করলেন। তাঁরা কি বুঝতে পারেন না এক সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে চিরকাল অবদমিত করে রাখা যায় না। এই মহাভারতের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্যাপ্ত বিস্তৃত হয়ে আছে যে অন্ত্যজ সমাজ—সংখ্যায় তারাই অসংখ্য। অজ্ঞানতাবশতঃ আজ তারা নির্জীব বটে, কিন্তু একদিন তো মেরুদণ্ড ঋজু করবেই। ভয় এবং জড়ত্ব পরিহার করে কোনও দিন যদি মাথা উন্নত করে তারা—সেদিন কি করবেন অন্ধ উন্মার্গগামী ভ্রষ্টবুদ্ধি এই ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়রা ?

কিন্তু ··না···নিজেকে সম্বরণ করতে চাইলেন পুরুধান। উদ্দেশ্যহীন চিন্তাচারণ ত্যাগ করে ফিরে আসতে চাইলেন আপাতঃ বাস্তবে। বার্দ্ধক্যের এই ব্যাধি। বয়স বলহরণ করে শরীরের, মস্তিষ্ক বিব্রত থাকতে চায় অর্থহীন অতীত চিন্তায়। কি যায় আসে ? এইসব দূরচিন্তা—দুরূহ সমস্যার সমাধান তো তাঁর সাধ্য নয়। হয়তো কাল স্বয়ং সূচিত করবে কোনও পরিবর্তন। কিন্তু তাতেই বা তাঁর কি ? তিনি পাণ্ডবদাস—স্বতন্ত্র বিচারবর্জিত সারথী—সারথীই থাকবেন। পৃথিবীতে যত পরিবর্তনই সূচিত হোক—কোনও সারথী কি কখনও সম্মানিত হয় ? মহাযুদ্ধ বিজয়ের গৌরব মহিমা সমর্পিত হয় রথীর শিরে—কেউ কি মনে রাখে সঙ্কুল সেই সঙ্কটাবর্তে স্বকর্মে সন্নিষ্ঠ সংবৃত চিত্ত কোনও এক সারথীর কথা।

আপাততঃ কিছু কর্তব্য আছে তাঁর। পুত্রের মঙ্গলামঙ্গলের দায়ভার তাঁর হাতে সমর্পণ করেছেন কুন্তী। দাস বোধে নয়··· পরিবারের বান্ধব বোধেই করেছেন। মানবোচিত এই মর্য্যাদা ইতিপূর্বে আর কে দিয়েছে তাঁকে।

অতএব তাঁকে জানতে হবে কি হয়েছে অর্জুনের। এবং—

একান্ত অসাধ্য না হলে প্রতিবিধানও করতে হবে।

অধোমুখে বসেছিলেন অর্জুন। মিথ্যাভাষণে অভ্যস্ত নন তিনি। পুরুধানের জিজ্ঞাসার উত্তরে যা সত্য তাই জানিয়েছেন। এখন ইচ্ছা হলে তিরস্কার করতে পারেন পুরুধান।

—নারী—হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন পুরুধান।—নারী?

কে নারী? কেমন নারী—কোথায় সে নারী? এই দূরদেশে, অরণ্যবেষ্টিত অনার্য প্রদেশে এমন নারী কে আছেন যিনি অর্জুনকে উদভ্রান্ত করতে পারেন।

অর্জুন নিরুত্তর। পুরুধান পথ চলেন অন্ধের মত। বিদেশের সর্ব বিষয়ের প্রতিই তিনি উদাসীন। অন্যথায় তিনি নিজেই অনুমান করতে পারতেন কে নারী—কেমন সে নারী!

তাঁকে নিরুত্তর দেখে পুরুধান বললেন, এ দেশের নারীরা তো সুন্দরী নয়। স্ত্রী-জনোচিত ব্রীড়াভাবেরও যথেষ্ট অভাব তাদের মধ্যে এমন পরুষভাবাপন্না নারীরা কখনই পুরুষের আকাঙ্খিতা হতে পারে না। বিশেষতঃ এরা বিজাতীয়া এবং আপনার অধিকার-বহির্ভূতা। অধিকার বহির্ভূতা নারীতে আসক্তি পুরুষের ধর্ম ও কর্মসকল বিনষ্ট করে। আপনি ধীর। বুদ্ধি ও বিচারবোধ আপনাতে প্রতিষ্ঠিত আছে। এমন হীন চিত্তবিকার আপনার শোভা পায়না পার্থ!

অর্জুন তথাপি নিরুত্তর। এই তর্ক নিজেই নিজের সঙ্গে করছেন তিনি দিবারাত্র। অপরিচিতা এক নারীতে আসক্ত হয়ে এই অশোভন উন্মাদনায় তিনি নিজেই যথেষ্ট লজ্জিত। অতএব নীতি উপদেশ দেবার অধিকার পুরুধানের আছে।

পুরুধান বললেন,—দেখা যায় নারীরাই এ সংসারে অধিকাংশ অনর্থের মূল। রিপু পরবশ পুরুষ অগম্যা নারীতে আসক্ত হয়ে প্রায়ই আহ্বান করে আনে আপন অমঙ্গল। কিন্তু আপনি ভরতবংশীয় রাজ-কুমার। আর্য্যাবর্ত্তের শ্রেষ্ঠ কুলমর্য্যাদা আপনাতে অবস্থিত। আপনি

ইচ্ছা প্রকাশ করলে ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গ কন্যা সম্প্রদান করবেন। সুরূপা ও সদ্‌গুণবতী শত শত কুলকামিনী আপনাকে কামনা করেন। আপনি কেন এই অনার্য্য দেশে কুৎসিতা, কুদর্শনা, কঠোর শ্রমে নিত্য নিরতা কোনও অনার্য্য নারীতে চিত্তনিবেশ করবেন? এই আসক্তি আপনার অনুচিত।

উদাসীন মুখে অর্জুন বললেন,—সুরূপা ও সদ্‌গুণবতী শত শত কুলকামিনীতে আমার কোনও আগ্রহ নেই। তাঁরা আমাকে কামনা করেন কিনা আমি জানি না। কিন্তু আমি কোনও আকর্ষণ অনুভব করিনা তাঁদের জন্য। অতএব এ প্রসঙ্গই অবান্তর।

—কিন্তু এই গন্ধর্ব দেশের কন্যা আপনি গ্রহণ করতে পারেন না। এরা অনার্য্য। আপনার ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে এদের মৌলিক পার্থক্য আছে।

—কি যায় আসে! এদের ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে আমার শিরঃপীড়া নেই। আমি কামনা করি এক নারীকে। তার ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থাকে নয়।

হতাশ দৃষ্টিতে চাইলেন পুরুধান—বোধ হচ্ছে আপনি নিতান্তই বশীভূত। এমন কিছু যে ঘটতে পারে তা অনুমান করা উচিত ছিল আমাদের। আমি শুনেছি গন্ধর্বরা মায়াধর জাতি। ডাকিনী বিদ্যায় নিপুণতা আছে পার্বত্য স্ত্রীলোকদের। আমার বিশ্বাস তেমনই কোনও এক কুহকিনী নারী মন্ত্রৌষধি দ্বারা আপনাকে বশীভূত করে—

চকিতে দৃঢ় হলেন অর্জুন। তীব্র দৃষ্টিপ্রহারে তাঁকে তিরস্কৃত করে বললেন, ধিক্ পুরুধান।—তিনি গন্ধর্ব ঈশ্বরী-চিত্রাঙ্গদা।

চিত্রাঙ্গদা!…

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন পুরুধান। গন্ধর্ব-গোষ্ঠীপতি বিচিত্রবাহনের কন্যা—যাঁর অলৌকিক কীর্ত্তিকথা ভাটমুখে গীত হয়—বিদেশে বিদ্বান কথকরা সুস্বরে বর্ণনা করে যাঁর বিচিত্র চরিত্র—

ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন—সে কন্যা আপনার অলভ্যা পার্থ; তিনি

অলোকলক্ষ্মা। অসম্ভব এই দুরাশা আপনি পরিত্যাগ করুন। সাধু ব্যক্তি কখনই পরস্ত্রীতে আসক্ত হন না—সে কথা আপনার অজ্ঞানা নয়।

কিন্তু—তিনি তো পরস্ত্রী নন। কুমারীকে কামনা করলে অধর্ম কি?

—তিনি বিচিত্রবাহনের কুলকন্যা। অপুত্রক বিচিত্রবাহন তাঁকে পুত্রবৎ পালন করেছেন। আপনি তাঁকে লাভ করবেন কোন উপায়ে?

গভীর লজ্জা কণ্ঠরোধ করে—সঙ্কোচ সীমাহীন—তথাপি কাউকে তো বলতেই হবে—কোথাও তো মোচন করতেই হবে দুর্বহ এই হৃদয়ভার—

নতদৃষ্টি, নতমুখ অর্জুন বললেন,—আমি—আমি তো প্রার্থনাও করতে পারি পুরুধান—প্রার্থীকে কি বিমুখ করবেন বিচিত্রবাহন?

—প্রার্থনা করবেন!—বিস্ময়ে প্রায় নির্বাক হয়ে গেলেন পুরুধান—প্রার্থনা করবেন—আপনি?—কৌরব-গৌরব, ভরতকুলোত্তম মহারাজ পাণ্ডুর পুত্র—আর্য্যাবর্ত্তের অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর—আপনি এই অরণ্যময় দেশে, অখ্যাত অনার্য নরপতির সমুখে করপুট প্রসারিত করে কন্যা ভিক্ষা করবেন। হা—আপনার কুলমর্য্যাদা আত্মগৌরব সবই কি আপনি বিস্মৃত হয়েছেন পাণ্ডব?

তীব্র তিরস্কার। কিন্তু কি করবেন—কি করতে পারেন অর্জুন। সহস্রগুণ তীব্র তিরস্কারে তিনি নিজেই তো নিজেকে বিদ্ধ—ব্যথিত করছেন অহরহ। ক্ষত বিক্ষত হচ্ছেন আত্মধিক্কারে। চিত্তনিগ্রহের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। কিন্তু—

কিন্তু হায়! একি দুরূপনেয় মোহ! তাঁর হৃদয় বিবশ স্বত্তা নিয়ন্ত্রণহীন। অন্ধ, বধির উন্মত্ত বাসনা কেবলই ধাবিত এক অসাধ্যের পানে। কি করবেন তিনি? বিদ্রোহী এই হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে আগে তো কখনও পরিচয় ঘটেনি। পাঞ্চালী স্বয়ম্বরে বধূলাভ ছিল গৌণ।

অগণ্য রাজন্যবর্গ শোভিত সভায় অন্যের অসাধ্য লক্ষ্য বিদ্ধ করে আপন পৌরুষের প্রতিষ্ঠাই ছিল প্রধান। এই তীব্র উন্মাদনা অনুভব করেন নি তখন। হৃদয় যে এত প্রবল হয়ে বুদ্ধিকে অতিক্রম করতে পারে—সে কথা এমন ভাবে উপলব্ধি করেছেন কি আর কোনও দিন ?

পুরুধান বললেন,—চিত্রাঙ্গদা স্বয়ং রাজ্যেশ্বরী। আপনি রাজা নন, যুবরাজও নন, রাজভ্রাতা। অমাত্য মাত্র বলা যায় আপনাকে। বিচিত্রবাহন কি সম্মত হবেন কন্যাদানে ? যদিও হন—একমাত্র পত্নীর মর্য্যাদা দিয়েই আপনি প্রাপ্ত হতে পারেন তাঁকে। কিন্তু এই বধূ কি খাণ্ডবপ্রস্থে যাবেন ? বহন করবেন পাণ্ডব সংসারের সুখ-দুঃখের ভার ? কয়েকটি বর্ণসংকর সন্তানের পিতৃত্ব ভিন্ন আপনি আর কি লাভ করবেন এই বিবাহে ?

—বর্ণসংকর !—আমি গ্রাহ্য করি না। বর্ণসংকর কোথায় নেই ? আমি পত্নীর মর্য্যাদাই দেবো তাঁকে।

—আর আপনার মাতা—ভ্রাতৃগণ। তাঁদের সম্মতি বিবেচ্য নয় বিবাহে ? তাঁরা সম্মত হলেও চিত্রাঙ্গদাকে আপনি প্রাপ্ত হতে পারেন কিনা আমার সন্দেহ আছে। প্রথমতঃ যাজ্ঞসেনীকে অতিক্রম করে অধিক কোনও মর্য্যাদা আপনি তাঁকে দিতে পারবেন না। দ্বিতীয়তঃ বিচিত্রবাহন পুত্রিকারূপে এই কন্যা লালন করেছেন মণিপুর রক্ষার জন্য। বহুদূর খাণ্ডব প্রস্থে পাণ্ডব সংসারে-খণ্ডিত কর্তৃত্ব বধূ পদবীর জন্য নয়।

জানেন—এ সমস্তই জানেন তিনি। চিত্রাঙ্গদা সম্বন্ধে কোনও তথ্যই আর অজানা নেই তাঁর। পুরুধান কি জানবেন—কি অধীর আকাঙ্ক্ষায় তৃষিত চক্ষু মণিপুরের পথের উপর নিবদ্ধ রাখেন তিনি। কেমন করে বলবেন শুধুমাত্র দর্শনের আশায় দীন ভিক্ষুকের মত এই তাঁর পথে পথে ভ্রমণ। অথচ হায় !—প্রতিবারের দর্শন অধিকতর হতাশাই উপহার দিয়ে যায় তাঁকে। ভরতকুলের শ্রেষ্ঠ রূপবান পুরুষ তিনি—পথে প্রান্তরে কত মানবচক্ষুর মুগ্ধ দৃষ্টি অদ্যাপি অভিনন্দিত

করে তাঁকে। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা—হায় পাষাণহৃদয়া নারী—মণিপুরে এক নবাগন্তুকের আবির্ভাব তিলার্দ্ধও বিচলিত করতে পারেনি তাঁকে। এই বিশ্ব চরাচরের কোনও কিছুই কি বিচলিত করে সেই আত্ম-নিমগ্নাকে!

এই ঔদাসীন্য—এই উপেক্ষাই আসক্তি আরও তীব্রতর করেছে তাঁর। দূরত্ব যত দুরূহ বাসনাও হয়েছে ততই প্রবল। পরিণামহীন এক ভবিতব্যের হাতে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করে বসে আছেন তিনি।

তাঁর বিশুষ্ক মুখ, বিহ্বল দৃষ্টি, প্রশান্ত ললাটে প্রবল মানসিক পীড়াচিহ্ন—উদ্বেগ সমধিক বর্দ্ধিত হল পুরুধানের। কাতর কণ্ঠে, মিনতি করে তিনি বললেন, যশ ও আয়ু ক্ষয়কারী এই মোহ আপনি পরিত্যাগ করুন পার্থ। অপ্রাপ্য বস্তুতে অভিলাষ পতনের পথ প্রশস্ত করে। কামনাকে অধিক প্রশ্রয় দেওয়া আত্মিক ভ্রষ্টতারই নামান্তর। আত্ম অবমাননা স্বীকারেরও একটা সীমা আছে।

—আছে। অর্জুন তা বোঝেন। অপ্রাপ্য বস্তুতে অভিলাষের যন্ত্রণা তিনি অহর্নিশি ভোগ করছেন। উপলব্ধি করছেন প্রশ্রয় প্রাপ্ত কামনার বিষম-বিকার। কিন্তু উপায় কি তাঁর।

—অথবা—ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন পুরুধান—আপনি বাহুবলে অধিকার করুন তাঁকে। বীর্য্যশুল্কে কন্যাগ্রহণ আপনাদের রীতি। সেই রীতি মতে হরণ করুন।

—হরণ করবো—! হতবুদ্ধি অর্জুন বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইলেন তাঁর পানে।

—তা ভিন্ন আর উপায় কি? আপনি যখন বাসনা-শাসনে অক্ষম, আর তাঁকে লাভ করবার কোনও সহজতর উপায়ও যখন নেই, তখন কুলরীতি অবলম্বনই আপনার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

—কিন্তু তার পরিণাম পুরুধান?

—পরিণাম হয়তো যুদ্ধও হতে পারে। তবে আমার মনে হয়

না ক্ষুদ্র-সামর্থ্য এই রাজা ততদূর অগ্রসর হবেন। বিশেষত প্রতিদ্বন্দ্বী যখন আপনি।

—আমার তা মনে হয় না পুরুধান। বলপ্রয়োগ এরা সহ্য করবে না।

যদি না করে—তাতেই বা কি? আপনি ভারদ্বাজ দ্রোণের শিষ্য। ভারতের শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরকালে আপনি কি একাই নির্জিত করেন নি সহস্র রাজেন্দ্রকে? যুদ্ধে আপনার ভয় কি?

—তথাপি—না ভয় কিছু নয়। যুদ্ধে ভয় করেন না তিনি। কিন্তু—সেখানেখাণ্ডব প্রস্থে রাজ্য অরক্ষিত, ভ্রাতারা উদ্বেগাকুল, উৎকণ্ঠিতা মাতা অধীর প্রতীক্ষায় পল গণনা করছেন তাঁর প্রত্যাবর্ত্তনের—এখানে এক নারী উপলক্ষ্য করে অবাঞ্ছিত যুদ্ধে জড়িত হবেন তিনি—!

হতাশ শ্রান্ত কণ্ঠে বললেন, তা হয় না পুরুধান।

অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করলেন পুরুধান। ক্ষত্রিয়দের এইসব আচার আচরণই চক্ষুশূল তাঁর। আত্মসংযমের তিলমাত্র অভ্যাস তাঁদের নেই, সমস্যার সরল সমাধানেও নেই শ্রদ্ধা। থাকুন অর্জুন তাঁর উদ্‌ভ্রান্ত চিন্তার জগতে একা—

তিনি যদি আত্মহত্যা করতে চান—পুরুধানের কিছুই করবার নেই।

উত্যক্ত এবং অতি অশান্ত চিত্তে স্থানত্যাগ করলেন তিনি।

হতবুদ্ধি অর্জুন নিরুপায়—সত্যই একা।

পুরুধানকে তিনি বোঝাতে পারেন নি বাহুবলে বিজয় করা যাবে না চিত্রাঙ্গদাকে। একমাত্র হৃদয় বন্ধনেই আবদ্ধ করা সম্ভব তাঁকে।

কিন্তু কি ভাবে? কোন উপায়ে?

তাঁর মস্তিস্ক বিবশ। চিন্তাশক্তি অবসন্ন। বিকলা বুদ্ধি বারবার অনুনয় করছিল এই দুঃসাধ্য থেকে বিরত হবার জন্য। বিরত হওয়াই যে মঙ্গল সে কথা অনুভবও করছিলেন তিনি।

কিন্তু—

সহসা ভয়ঙ্কর এক ক্রোধ তপ্ত লাভা প্রবাহের মত সঞ্চারিত হল সর্বাঙ্গে। যথার্থ বলেছেন পুরুধান। বাহুবলেই তিনি অধিকার করবেন তাকে। কিসের দ্বিধা—কাকে ভয়? তিনি ভারদ্বাজ দ্রোণের শিষ্য। এক রথে এক শরাসনে পৃথিবী শাসন করতে সমর্থ। উৎপাটিত চম্পক তরুর মত এই গন্ধর্ব ভূমি থেকে সবলে ছিন্ন করে নিয়ে যাবেন সেই দর্পিতা নারীকে। তারপর তার সকল গর্ব, ইচ্ছা অনিচ্ছা—অনুরাগ কিংবা অনামন্ত্রণ মর্ষণ করবেন রাক্ষসী প্রথায়। অবশ্যা নারীকে কেমন করে বশ করতে হয় সে তত্ত্ব তাঁর জানা আছে।

কিন্তু···পরমুহূর্তেই এক প্রবল হতাশা—প্রবলতর অবসাদ এসে গ্রাস করে তাঁকে। চিত্রাঙ্গদা তো অসমর্থা নন। অন্তঃপুরচারিণী আর্য্যনারীদের মত অবলাও নন। আত্মরক্ষায় যদি স্বয়ং শস্ত্র ধারণ করেন তখন কি করবেন অর্জুন?

যুদ্ধ? অথবা হত্যা করবেন তাঁকে? যে নারী যুদ্ধ জানে বল-প্রয়োগে বশ করা যাবে তাকে?

অসম্ভব। হায় পুরুধান! তুমি কেমন করে জানবে সমস্যা কত জটিল!

পুরুধান বলেছেন এ মায়া—আয়ুঃক্ষয়কর মোহ।

মোহ?—এই যে প্রাণক্ষয়কারী তীব্র এক যন্ত্রণা সর্বদা জারিত করছে তাঁকে—এই যে শরীর শক্তিহীন, বাহু বিবশ—উদ্‌ভ্রান্ত মস্তিস্ক অশান্ত চিন্তার প্রবাহ ধারণে অক্ষম—এ মোহ? পূর্ব জন্মার্জিত পাপ-জ্বরের মত এক দাহ সন্তপ্ত করছে সর্বাঙ্গ—এও মোহ? অসংযত চিত্তের উন্মত্ত বাসনা বিকার? অথবা—

অথবা এই প্রেম! প্রেম? বিচিত্র বেদনা বিদ্ধ এক হাসি দেখা দিল তাঁর ওষ্ঠাধরে। প্রেম! তবে যে বন্ধুজনে বলে প্রেম স্বর্গীয় সুখের আকর। হায় এই কি সেই সুখের আস্বাদ?

হ্যা—যৌবনের এই স্বর্ণোজ্জ্বল মুহূর্তে জীবনের প্রথম প্রণয় তাঁর কাছে এল এমন হত্যাকারীর মূর্ত্তিতে!

গভীর আবেগে উন্মোথিত হল বীরবক্ষ। পরিত্যক্ত প্রবঞ্চিত নিঃসহায় বলে বোধ হল নিজেকে। শীতল পাষাণ চত্বরে ললাট রেখে অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন, হায় নারী—যন্ত্রণারূপিণী !···

হায় পঞ্চশর ! কালাকালের অধীশ্বর যোগীন্দ্র মহাকালও ব্যথিত হয়েছিলেন তোমার শরাঘাতে। পাণ্ডুপুত্র আর কত শক্তিমান !

॥ ৬ ॥

অন্তহীন বিতর্ক, অর্থহীন সময়ক্ষয়। ক্লান্ত কণ্ঠে চিত্রাঙ্গদা বললেন.
—আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না মণিমান—এক অতি সাধারণ বিষয়কে তুমি এত জটিল করে তুলছো কেন। বিভিন্ন রাজশক্তির মধ্যে পারস্পরিক মৈত্রী ভাবনা দীর্ঘদর্শী রাজনীতিরই এক অঙ্গ। সংঘর্ষের সম্ভাবনা রুদ্ধ করতে সম্প্রীতির তুল্য উপায় আর কি আছে ? পাণ্ডবের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপিত হলে আমাদের মঙ্গল হবে।

—এতদিন সে সৌহার্দ্য না থেকেও আমাদের কোনও অমঙ্গল হয় নি চিত্রাঙ্গদা। আমাদের কোনও শত্রু নেই, স্বেচ্ছাক্রমে সংঘর্ষের পথে পদপাত করবো না আমরা। অতএব উপযাচক হয়ে সম্প্রীতি সন্ধানের প্রয়োজন কি ? তা ভিন্ন পাণ্ডবরা নিজেরাই তো এখনও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নি। তাঁরা আমাদের কোন উপকারে আসবেন ? ভারতে তাঁদের অপেক্ষা যোগ্যতর আরও অনেক রাজশক্তি বর্তমান।

বিশেষ বিপন্ন বোধ করছিলেন চিত্রাঙ্গদা। একি বিভ্রাট উপস্থিত হল অর্জুনকে উপলক্ষ করে। হিমাচল-সন্নিহিত এই শান্ত প্রদেশে আকস্মিক যেন এক দৈবী উৎপাতের মত আবির্ভূত হয়েছেন অর্জুন। ভ্রমণকারীরা সাধারণতঃ একস্থানে অধিক দিন বাস করেন না। দর্শনীয় যা কিছু দেখা হয়ে গেলে যাত্রা করেন অন্যত্র। অর্জুন অনেকদিন রয়েছেন এখানে। কেন তা চিত্রাঙ্গদা জানেন না। উদ্দেশ্য বোঝা যায় নি তাঁর, অসদুদ্দেশ্য কিছু আছে কিনা তাও অজ্ঞাত। নিজে সর্বদা নগরী এবং পণ্যস্থলীতে বিচরণ করেন আর তাঁর অনুচরবর্গ উন্মত্ত থাকে মৃগয়া বিলাসে। স্বভাবে এই অনুচররা কিঞ্চিৎ উচ্ছৃঙ্খল। মণিপুর অরণ্যে পশুবধের বিধিনিয়ম ইতিমধ্যেই কিছু কিছু লঙ্ঘন করেছে তারা। চটুল আচরণে মণিপুর ললনাদের উত্যক্ত করার

কাহিনীও দু-একবার কর্ণগোচর হয়েছে তাঁর। বয়সে তারা যুবা, মণিপুর রমণীরাও গুণ্ঠিতা বা অবরোধবাসিনী নন, অতঃ সে সব ঘটনায় তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নি তিনি। তা ভিন্ন মণিপুরের রাজকীয় বিধি-নিয়ম মণিপুর অধিবাসীদের জন্য যত অলঙ্ঘনীয়ই হোক একদল বহিরাগতকে সহসাই ধরে এনে শাসন করা যায় না সে নিয়মের ব্যত্যয় করার অপরাধে। বিশেষতঃ সে দলের নেতা যখন অর্জুন।

এইসব উপদ্রবের শান্তি ঘটে তিনি যদি প্রস্থান করেন মণিপুর ত্যাগ করে। কিন্তু তিনি এখনও আছেন এবং শীঘ্র প্রস্থান করবেন এমন কোনও লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে না তাঁর আচরণে।

এদিকে সখী ইরাবতী পুনরায় এক বার্তাবাহক প্রেরণ করেছেন তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়তম পাণ্ডবকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনার অনুরোধ জানিয়ে। চিত্রাঙ্গদার মনে হয় তাঁর পিতা কৌরব্যেরও সমর্থন আছে এ বিষয়ে। সম্ভবতঃ তিনিও ইচ্ছা করেন অবিরাম বন-ভ্রমণে ক্লান্ত তাঁর জামাতা কিছুকাল মণিপুর রাজভবনের আতিথ্য ভোগ করেন।

অস্বাভাবিক কিছু নয় মণিপুরের কোনও মান্যব্যক্তি যদি নাগরাজ্যে প্রবাসিত হন—চিত্রাঙ্গদা নিজেও কি আশা করবেন না নাগপুরে তাঁর সমাদর? নাগেন্দ্র কৌরব্য পিতা বিচিত্রবাহনের ঘনিষ্ঠ মিত্র, কন্যার সখী—কন্যাপ্রতিম চিত্রাঙ্গদাকেও তিনি স্নেহ করেন। এতটা আশা তিনি তো করতেই পারেন।

ইরাবতী অধিক শঙ্কিত হয়েছেন আসন্ন ঋতু-পরিবর্তনের কথা চিন্তা করে। বসন্তকাল সমাপ্ত প্রায়। সম্মুখে উষ্মঋতু। হিমাচলের এই উত্তরণ ভাগে উষ্মঋতু অধিককাল স্থায়ী হয় না। মধ্য নিদাঘেই বর্ষাগম হয়ে থাকে কখনও কখনও। পর্বত-বিদারী সে বর্ষার প্রচণ্ড প্রতাপ কুরু কিংবা পাঞ্চাল প্রদেশের অধিবাসীরা কল্পনাও করতে পারবেন না। পার্বত্য নদনদী প্রবলাকার ধারণ করে। স্বল্পজল নির্ঝরিণীরাও হয়ে ওঠে ভয়ানক। ঘোর গর্জনে দিক্‌দিগন্ত কম্পিত হয়। বসুমতী

বিধ্বস্ত, তীরভূমি প্লাবিত করে অরণ্যের বৃদ্ধ বনস্পতির মূল পর্য্যন্ত উৎপাটন করে নিক্ষেপ করে গর্জমান জলস্রোতে। অরণ্যবাস তখন মহা সংকটের হেতু হতে পারে। অর্জুন সে অবস্থার কিছুই জানেন না, পরমানন্দে অবস্থান করছেন অরণ্যে আর বহুদূর নাগরাজ্য থেকে সশঙ্কিতা ইরাবতী প্রেরণ করছেন বার্তার পর বার্তা।

বিরক্ত বোধ করছিলেন চিত্রাঙ্গদা। বারংবার বার্তা না পাঠিয়ে ইরাবতী স্বয়ং একবার উপস্থিত হতে পারতেন। অবস্থা জ্ঞাত করে তাঁর 'প্রাণাধিক প্রিয়তম'কে তিনি নিজে অপসারণ করলেই চিত্রাঙ্গদার পক্ষে স্বস্তিজনক হত। কিন্তু ইরাবতী আসেন নি. সহসা আসবেন এমন কোনও সম্ভাবনাও নেই।

সমস্যাব সমাধান ঘটে অর্জুনকে কিছুদিন মণিপুর রাজভবনে স্থানান্তরিত করতে পারলে। বিচিত্রবাহনের এ বিষয়ে কোনও মতামত নেই। তাঁর মতে এ নিতান্তই সামান্য ব্যাপার মণিমানের সঙ্গে মন্ত্রণা করে চিত্রাঙ্গদা নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন এ বিষয়ে।

কিন্তু বহু চেষ্টা করেও মণিমানকে সম্মত করাতে পারছেন না তিনি। এই বিদেশীদের প্রতি সামান্যতম সৌজন্য প্রকাশেও তাঁর আপত্তি। সমতলের রাজা ও রাজবংশীয়দের প্রতি বিরাগ তাঁর আছে, কিন্তু অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে সে বিরাগের যে উৎকট প্রকাশ—এমন আর কখনও দেখেননি চিত্রাঙ্গদা। অথচ—

অথচ কোনও বিষয়েই তাঁকে উপেক্ষা করে কিছু করতে পারেন না তিনি। মণিমান কেবল তাঁর মন্ত্রণাদাতাই নন, তাঁর আশৈশবের বন্ধু ও সহচর। সেই সুদূর কোন বাল্যকালে—গুরুগৃহে, অস্ত্রচালনায়, অশ্বারোহণে কিংবা বিদ্যাভ্যাসে একত্র কর্মকালের সূচনা হয়েছিল তাঁদের—অদ্যাপি তা অক্ষুণ্ণ আছে। মণিমানের অধিক শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁর কে আছে? সদা সতর্ক সে মঙ্গলভাবনা তিনি উপলব্ধি করেন বৈকি। তাঁকে অতিক্রম করতে বা আঘাত দিতে বেদনা তাঁর নিজেরও কম বাজবে না।

চিন্তা করতে করতে মুখশ্রী কোমল হয়ে এল তাঁর। অকারণে উত্তেজিত বাল্য বান্ধবটির তপ্ত মূর্ত্তি দেখে কিঞ্চিত কৌতুকও বোধ করলেন। পরম মমতাভরে প্রশ্ন করলেন, ভারতের অন্য কোনও যোগ্যতর রাজশক্তির সঙ্গে মৈত্রী-বন্ধনে তুমি সম্মত মণিমান?

এই একই প্রশ্ন কিছুদিন পূর্বে রাজা বিচিত্রবাহনও করেছিলেন, উত্যক্ত চক্ষে চাইলেন মণিমান—আর কতবার উত্তর দিতে হবে একই জিজ্ঞাসার বললেন,—না।

—কারণ?

—কারণ সমতল ভারতের ক্ষত্রিয় জাতিকে আমি বিশ্বাস করি না। সিন্ধু, সরস্বতী কি না পঞ্চনদ-তীরবর্ত্তী আর্য্যজাতির সঙ্গে পার্বত্য কিংবা আরণ্যক অনার্য্যদের বন্ধুত্ব কখনও হয়নি—হবেও না।

—অদ্ভুত তোমার যুক্তি মণিমান, আমি বুঝতে পারি না।

তিক্ত কণ্ঠে মণিমান বললেন, বুঝতে পারো না নয়, তুমি বুঝতে চাও না এই আর্য্যজাতির সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক আছে চিত্রাঙ্গদা? আমরা কি কেবলই শোষিত ও নির্যাতিত হইনি তাদের হাতে? রাক্ষস অথবা অসুর অভিধা দিয়ে তারা বিতাড়ন করে নি আমাদের? নদ-নদী-বিধৌত যে সুফলা ও ঐশ্বর্য্যময়ী ভূমির আধিপত্য লাভ করে আজ তারা এত সমৃদ্ধ—সেই ভারতভূমি কি এক কালে আমাদের—এই অনার্য্যদেরই অধিকারে ছিল না? তারপর উন্নত রণকৌশলে অভিজ্ঞ তাদের আবির্ভাব ঘটলো, যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পুরাতন মাতৃভূমি পরিত্যাগ করে আমরা আশ্রয় নিলাম অরণ্যে পর্বতে। তারও পরে—যুগ যুগ ধরে কঠোর শ্রম এবং অবিরাম প্রযত্নে নিষ্ফলা, উপলাস্তীর্ণ, অরণ্যময় এই পার্বত্য ভূমিকেও সমৃদ্ধ করেছেন আমাদের পিতৃ-পিতামহগণ। আমি চাই না পুনরায় নূতন করে কোনও আগন্তুক আর্য্যশক্তির লোভী দৃষ্টি লেহন করুক আমাদের সমৃদ্ধি। নূতন করে লুণ্ঠিত হোক আমাদের ভূমি, বিত্ত, পশু, অপহৃতা হয়ে দাসী কিংবা উপ-

পল্লীতে পুনর্বাসিতা হন আমাদের নারীরা। আমরা আবার বিতাড়িত হই আরও দুর্গম কোনও পর্ব্বত কিংবা দুর্গমতম অরণ্যের সন্ধানে।

স্তম্ভিত চিত্রাঙ্গদা নীরবে শুনছিলেন তাঁর বক্তব্য। সবিস্ময়ে বললেন, এ কি অযথা দুশ্চিন্তা মণিমান! সময় এগিয়ে চলেছে, কাল পরিবর্ত্তনশীল। অতীতের সেই অজ্ঞ, সরল, উন্নত রণকৌশলে অনভিজ্ঞ জাতি আর আমরা নই। এই পৃথিবীতে সবল চির-কালই দুর্বলের উপর আধিপত্য করে। কিন্তু এখন তো আমরা দুর্বল নই। আঘাতের উত্তরে প্রতি-আঘাত করবার সামর্থ্য আমাদের আছে। আমরাও যুদ্ধ জানি, রণকৌশল কিংবা সমরাস্ত্রও আমাদের আছে। প্রয়োজনে প্রতিস্পর্দ্ধা করতে আমরা সমর্থ। অর্থহীন অতীত চিন্তায় অযথা শিরঃপীড়া সৃজনের হেতু কি?

—হেতু আছে। অতীত শুধুই অতীত নয়, ভবিষ্যৎ চিন্তার নির্দেশকও বটে। অতীতের অভিজ্ঞতাই আমাদের শিক্ষা দিতে পারে ভবিষ্যতের সঙ্কট কেমন ও কোথায়। এই পৃথিবীতে সবল যেমন দুর্বলের উপরে আধিপত্য করে তেমনই দুর্বলের সঙ্গে সবলের বন্ধুত্বও কখনও হয় না চিত্রাঙ্গদা; যা হয় তা আশ্রিত এবং আশ্রয় দাতার সম্পর্ক।

—আমরা দুর্বল নই, পাণ্ডবও নবোদিত, এ বন্ধুত্ব সমানে সমানে হবে মণিমান।

মণিমান স্তব্ধ। কেমন করে তিনি বোঝাবেন নবোদিত পাণ্ডবের সঙ্গে এখন বর্দ্ধিষ্ণু পাঞ্চালের শক্তি সম্মিলিত হয়েছে। ক্ষুদ্র এই গন্ধর্ব জাতির সমস্ত সামর্থ একত্রিত করলেও যার সমান হয় না। বললেন, এঁদের সম্বন্ধে তুমি অধিক কিছু জানো না চিত্রাঙ্গদা।

অন্ততঃ তুমি যতটুকু জানো ততটুকু জানবার দাবী তো আমি করতে পারি মণিমান। আমার সখী ইরাবতী—

—ইরাবতী বুদ্ধিহীনা—তপ্তস্বরে মণিমান বললেন, বুদ্ধিমতী হলে গোষ্ঠী ভঙ্গ করে এক বহিরাগতকে বরণ করতে পারতেন না।

—কিন্তু আমি শুনেছি পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ধীর ও ধর্মপরায়ণ।

দিগ্বিজয়ের নামে পররাজ্যগ্রাস কিংবা যুদ্ধ নামক সামূহিক নরহত্যা সমর্থন করেন না তিনি।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে মণিমান বললেন, তোমার পাণ্ডব ভক্তি দেখে প্রীত হলাম চিত্রাঙ্গদা। কিন্তু তুমি কি নিশ্চিত? নিশ্চিত যে নবোদিত বলেই নিষ্প্রভ নন তাঁরা? আজকের স্বল্পশক্তি পাণ্ডব কাল অধিকতর সামর্থ সঞ্চয় করে দুর্দ্ধর্ষ হয়ে উঠবে না? আজকের শান্ত ও অহিংস যুধিষ্ঠির কাল উন্মত্ত হবেন না মহারাজ চক্রবর্তী পদবী লাভের লোভে?

মুখ গম্ভীর হল চিত্রাঙ্গদার। ললাটে দেখা দিল সামান্য ভ্রুকুটি। এ কি নির্বুদ্ধিতা! দূর ভবিষ্যতে কি হতে পারে সে কথা চিন্তা করে বর্তমানের প্রতিটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ কর্তব্য তো নিরূপিত হতে পারে না, নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না দৈনন্দিন প্রত্যেক বিষয়। বললেন, যদি তাই হয় তাহলেই বা আমাদের কি আসে যায়। আর্যজাতির স্বভাব সংশোধনের কোনও ব্রত আমরা গ্রহণ করি নি। যুদ্ধ নামক যে ব্যসনের চর্চায় তাঁরা নিয়ত নিরত—সে বিষয়ে কোনও ব্যতিক্রম ঘটানোও আমাদের সাধ্যাতীত। গন্ধর্ব জাতি ভীরু নয়, তারা বীর ও বিক্রমশালী। এখন তারা সংগঠিতও বটে। ভাবী কালে কোন আপদ উপস্থিত হলে আমরা সম্মিলিতভাবে তা প্রতিরোধ করবো। এখনই এত দুশ্চিন্তার আবশ্যক কি?

আবশ্যক আছে। কিন্তু সে কথা এই মুহূর্তে এই নারীকে বোঝানো যাবে না। অতএব মণিমান নিরুত্তর।

—অর্জুনকে তুমি ঘৃণা কর মণিমান?

মণিমান শিহরিত হলেন। এত সুস্পষ্ট প্রশ্ন···বিহ্বল চক্ষে চাইলেন চিত্রাঙ্গদার মুখপানে। নিষ্পলক যুগ্মচক্ষুর স্থির দৃষ্টি উদ্যত বর্শা-ফলকের মতই তাঁর মুখের উপর নিবদ্ধ। উত্তর দিতে হবে।

—অথবা ভয়—বললেন চিত্রাঙ্গদা। মণিপুরে তো বহিরাগতের অভাব নেই। বণিক, শ্রমিক, পর্যটক, নট, ভাট—নানা জাতির নানা কর্মে নিরত মানুষের আগম নির্গমে সর্বদাই ব্যস্ত থাকে মণিপুর।

অর্জুন সেই জনপ্রবাহের অন্যতম আর একজন—তাহলে অর্থহীন, হেতুহীন কেন তোমার এই বিদ্বেষ?

—বিতৃষ্ণা—কষ্টে উচ্চারণ করলেন মণিমান। শুধু অর্জুন নয়, আর্য্য উপাধিধারী সমস্ত দল সমস্ত জনগোষ্ঠি সম্বন্ধেই আন্তরিক বিতৃষ্ণা আমার। লোভী, যুদ্ধ ব্যবসায়ী, সর্বদা শস্ত্রোদ্ধত এই জাতির সংস্রব বিপদ্‌জনক হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

—সে বিশ্বাস তোমার নিজস্ব। মণিপুর রাজবিধির উপরে তাকে তুমি আরোপ করতে পার না।

—তা পারি না। নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন মণিমান। শ্রান্তস্বরে বললেন,—মণিপুর রাজবিধি কোনদিন বিদেশীর পুর-প্রবেশ অনুমোদন করেনি।

—করে নি: কিন্তু কোন দিন করবে না—এমন কোনও অঙ্গীকারেও আবদ্ধ হয়নি মণিমান। যোগ্য জনের সমাদর সব রাজ-বিধানেই অনুমোদিত। অর্জুন কি অর্চনাযোগ্য নন?

আতঙ্কিত হলেন মণিমান। এই প্রশ্নেরই আশঙ্কায় সর্বদা কণ্টকিত হয়ে আছেন তিনি। এই সেই কণ্ঠস্বর—যার সম্মুখে তিনি চিরকাল নিরুত্তর। এই ব্যক্তিত্ব তাঁর অহংকে ধূলিস্মাৎ করে, টলিয়ে দেয় আত্ম-বিশ্বাসের ভিত্তিমূল। তীব্র অভীপ্সার সঙ্গে এক অদ্ভুত সমীহবোধেও আজীবন আক্রান্ত তিনি। অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন, তিনি যোগ্য।

—মহৎ এবং শৌর্যশালীরূপে তিনি কি প্রখ্যাতি অর্জন করেন নি?

—করেছেন।

—অদ্যাপি তাঁর আচরণে আপত্তিকর কিছু প্রকাশ পেয়েছে কি?

—না।

—তাহলে অর্জুন সম্বন্ধে তোমার এই প্রবল বিতৃষ্ণার কারণ কি? একের অপরাধে তুমি সকলকে অভিযুক্ত করতে পার না মণিমান। স্বভাবতঃ ক্ষত্রিয়েরা উগ্র এবং শক্তিমত্ত। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ক্ষত্রিয়মাত্রেই লোভী, হিংসক কিংবা পর-পীড়ন পরায়ণ। একদা

আমরা এই অনার্য্যরাও কি যথেষ্ট যুদ্ধপ্রিয় ছিলাম না? দীর্ঘ—সুদীর্ঘ কাল আমরাও কি লিপ্ত ছিলাম না আত্মক্ষয়ী পারস্পরিক সংঘর্ষে—এবং অবশেষে অনেক ক্ষয় ক্ষতি অনেক শোকাবহ পরিণতির পর আমরা উপলব্ধি করেছি শান্তির প্রয়োজনীয়তা। হয়তো আজকের এই শস্ত্রোদ্ধত ক্ষত্রিয়রাও একদিন—

কঠিন—শ্লেষতীক্ষ্ণ, বক্র এক হাস্যরেখা দেখা দিল মণিমানের অধরে। বললেন, ততদিনে আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে।

তপ্তস্বরে চিত্রাঙ্গদা বললেন, কিন্তু সে দিন বহুদূরে। আপাততঃ আমাদের কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই, এবং এই মুহূর্তে আমি তোমাকে—হ্যাঁ তোমাকেই জিজ্ঞাসা করছি—অর্জুন কেন অভ্যর্থিত হবেন না মণিপুরে? উত্তর দাও মণিমান—

হতাশ দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চাইলেন মণিমান। অবসন্ন নিঃশ্বাসে [illegible] হল [illegible] শঙ্কাভ্রান্ত [illegible] আশা! কোন অন্ধ দুরাশার বশবর্তী হয়ে ক্রমাগত আবর্তিত হয়ে চলেছেন তিনি! বিকার-হীন প্রস্তর প্রাচীরে আঘাত করছেন আজীবন, ললাট দীর্ণ হল কিন্তু পাষাণে জাগে নি প্রাণের আভাস।

—মণিমাণ!

অন্তরে অন্তরে বিধ্বস্ত হয়ে আসছিলেন মণিমান। নিয়তি-নির্দেশিত অমোঘ পটভূমিকায় অঙ্কিত আপন সেই বিধ্বস্ত অস্তিত্বকে যেন উপলব্ধি করলেন তিনি। বললেন, আমার আর কিছু বলবার নেই।

—আছে—কম্পমান ভূলুণ্ঠিত সেই অস্তিত্বের উপর আরও এক নির্ঘাত আঘাতের মত নিক্ষিপ্ত হল চিত্রাঙ্গদার কণ্ঠস্বর। আছে—আরও কিছু কথা—যা গোপন। যা এই রাজ্যের নয়, গন্ধর্বের নয়, এই জাতির ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গলেরও নয়—যা তোমার, একান্ত ভাবেই তোমার। সে কথা আমাকে জানতে হবে। তুমি আমার বন্ধু, সখা, আমার আশৈশবের শ্রেষ্ঠ সহচর—কখনও লঙ্ঘন কর নি আমাকে—

অতিক্রম কর নি আমার অভিপ্রায়। সেই তোমার এই বিচিত্র পরিবর্তন কেন ? কোন ভীতি কিংবা ভ্রান্তি প্ররোচিত করছে তোমাকে অনভ্যস্ত, অনভিপ্রেত এই মিথ্যাচারে—

মিথ্যাচার !—নিমেষে উদ্দীপ্ত হলেন মণিমান। মিথ্যাচার চিত্রাঙ্গদা ? তোমার বন্ধু, সখা, সহচর মণিমানকে তুমি এইমাত্র জান ?

—আমি সত্য জানতে চাই মণিমান।

—অন্তরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে ফিরে দাঁড়ালেন মণিমান। সুগৌর মুখ রক্তাক্ত হল শোণিতোচ্ছ্বাসে। দ্বিধাহীন দীপ্ত দৃষ্টি তাঁর মুখের উপর প্রসারিত করে বললেন, সত্য স্বয়ং প্রকাশ করে নিজেকে। আমি না জানালেও তোমার তা উপলব্ধি করা উচিত ছিল। আমার সব প্রতিরোধই কেবল মাত্র অর্জুনের জন্য কেবল মাত্র তোমাকে উপলক্ষ্য করে।

—আমাকে উপলক্ষ্য করে !

—তুমি জান না চিত্রাঙ্গদা, কিন্তু মণিপুরের সমস্ত মানুষ জানে পর্যটন নয়, তার চেয়ে গভীর—গভীরতর অন্য এক আকর্ষণ অর্জুনকে আবদ্ধ করে রেখেছে মণিপুরে। সামান্য কিছু নয়, স্বয়ং তোমাকে করায়ত্ত করবার জন্যই এই তাঁর কষ্টসহ প্রবাস বাস।

—মণিমান !

—অচেতনকে সতর্ক করা সম্ভব, কিন্তু স্বেচ্ছানিদ্রিত যে অঙ্কুশাঘাতে তার চৈতন্য সম্পাদনে আমার বিশ্বাস নেই। তথাপি আমি তোমাকে অনুরোধ করি চিত্রাঙ্গদা—তুমি নিরস্ত হও। গন্ধর্বের শিরোমণি হরণ করতে চায় যে লোভী বাসনা—তিলমাত্র প্রশ্রয় প্রসারিত করো না তার প্রতি। সুদূর খাণ্ডবপ্রস্থ থেকে উঠে আসা ইচ্ছা প্রত্যাখ্যাত হোক। অনাদৃত—অনভিনন্দিত পার্থ ফিরে যান তাঁর আপন পরিমণ্ডলে। চিত্রাঙ্গদা, আমি তোমার সখা—সুহৃদ—কখনও লঙ্ঘন করিনি তোমাকে, অতিক্রম করিনি তোমার ইচ্ছা, কখনও প্রার্থনা করিনি কিছু—আজ

আমার প্রার্থনা—দয়া করো—তোমার আবাল্যের বন্ধু, মিত্র, ছায়া-সহচর এই মণিমানকে।

স্তম্ভিত চিত্রাঙ্গদা নির্বাক। এতদিনের প্রহেলিকা নিমেষে নির্মুক্ত। এ কি বিস্ময়!…জীবনের দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসে একি বিচিত্র অচিন্ত্যপূর্ব উন্মোচন! মেঘাবৃত আকাশে বিদ্যুৎচমকের মত নিমেষে নিরাবরণ হল যে সত্য—তা যেমন নিষ্ঠুর তেমনই বেদনাময়। আর্ত্ত, অধীর—যন্ত্রণাবিদ্ধ স্বরে তিনি উচ্চারণ করলেন, মণিমান—মণিমান তুমি…

আশঙ্কায়, নৈরাশ্যে, অবদমিত বাসনার দীর্ঘ যাতনায় ক্ষিপ্তোন্মত্ত মণিমান বললেন, হাঁ আমি—আমিই। কিন্তু কি আসে যায় তাতে। আমি তো নীরব ছিলাম, নীরবই থাকতে পারতাম আরও অনেকদিন। অন্তরের অন্তস্তলে যদি থেকেও থাকে কোনও আশা আমি তাকে অনুক্তই রাখতে পারতাম। নিদ্রিত বাসনার মুখাবরণ অপসারণে আমার প্রবৃত্তি ছিল না। কিন্তু এখন—এতদিন পরে তুমি—তুমিই আমাকে বাধ্য করলে চিত্রাঙ্গদা। সুদূর আর্যাবর্ত্ত থেকে উঠে আসা এক দীর্ঘকায় কৃষ্ণকান্তি পুরুষ—যার অমোঘ আকর্ষণ—কিংবা—না, তুমি নও, তিনিও নন। এ আমারই অদৃষ্ট লিখন—

থামলেন তিনি। ঘন ঘন তপ্তশ্বাসে খণ্ডিত হল স্তব্ধতা। শব্দহীন, বাক্যহীন দুই বাল্য-বান্ধব অসীম বেদনা ও বিস্ময়ের দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলেন পরস্পরকে। চিত্রাঙ্গদার মনে হল তাঁর হৃৎস্পন্দন থেমে যাবে, মনে হল হৃদয় ও মস্তিষ্কের অগোচর এই স্তব্ধতা পর্বতোপম হয়ে পিষ্ট করবে তাঁকে—তাঁর আত্মা ও অস্তিত্বকে।

ক্লান্ত—নিঃশেষিত শক্তি মণিমান ভগ্নপ্রায় রুদ্ধস্বরে কোনও মতে বললেন, তোমাকে দোষারোপ করা অর্থহীন চিত্রাঙ্গদা। দায়ী আমি নিজেই। সময় চলে গেছে। প্রত্যাশার পাত্র উন্মুক্ত করতে পারিনি আমি, আধিপত্য বিস্তারেও রুচি ছিল না কোন দিন। আজ আত্মদর্শন হয়েছে বড়ই বিলম্বে। এখন তুমি আমাকে করুণা করতে পারো—এমন

কি ঘৃণাও। অশক্তের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে পৃথিবীতে কোথাও কারও কোন ক্ষতি হয় না। পরিমাণহীন এই প্রমাদের দায় আমার আমি একাকীই বহন করবো তা।

নিস্তব্ধ বসেছিলেন চিত্রাঙ্গদা। সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেল সময়ের নিয়মেই। প্রজ্জলন্ত দ্বিপ্রহর ম্লান হয়ে এলো আরক্ত অপরাহ্নে। দিনান্তের রক্তসূর্য অস্তাচল-চূড়া-গামী হয়ে পৃথিবীকে জানাল বিদায় অভিনন্দন। প্রশান্ত পার্বত্যভূমি আঁধার করে উঠে এল নম্র, নীরব শান্তমুখী সন্ধ্যা—

চিত্রাঙ্গদা তখনও স্তব্ধ। প্রস্তর প্রতিমাবৎ তাঁর সেই মূর্তি দেখে দাসীরা ফিরে গেল, পৌরজন সাহস করল না তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করতে। শূন্য গৃহে, দীপহীন অন্ধকারে নিশ্চল বসে রইলেন তিনি—একা।

সুদীর্ঘ এক তপ্তশ্বাসে হৃদয় ভার প্রবাহিত করে উঠলেন তিনি। দাঁড়ালেন বাতায়নে।—হঁা তিনিও দেখেছেন। না দেখবার কোনও কারণ নেই। মণিপুরের পথে পথে ভ্রাম্যমান দীপ্তোজ্জ্বল সেই প্রাংশু পুরুষ—কে না দেখেছে তাঁকে! অবিরাম পরিভ্রমণে শ্রান্ত শীর্ণ মুখ আর সকাতর দুই চক্ষে ব্যাকুল মুগ্ধতা—হঁা তাও দেখেছেন তিনি। তিনি তো অন্ধ নন। কিন্তু সে ব্যাকুলতা…একি বিচিত্র বার্তা বিবৃত করে গেলেন মণিমান! এমন ভাবে কোনও দিন তো চিন্তা করেন নি চিত্রাঙ্গদা। কামিনীকুল-কাঙ্খিত বিশাল সেই বীরবক্ষ—কণ্ঠবিলম্বিত রত্নমাল্যও যে বক্ষের দীপ্তিহরণে ব্যর্থ—কিন্তু চিত্রাঙ্গদা তো কোনও মোহ অনুভব করেন নি। করবার অবকাশ ছিল না তাঁর। প্রতিদিনের শত সহস্র কর্মভারে অবনত চিত্তে অলস কোনও বাসনা-বিলাসের অবসর কোথায়?

কিন্তু এখন—একি অনাস্বাদিতপূর্ব পুলকাবেশ শিহরিত করছে তাঁর সর্বাঙ্গ! এ অনুভূতির আস্বাদ অননুভূত তাঁর। এ কিসের উন্মাদনা…

উন্মাদনা? নিজেকে প্রশ্ন করলেন তিনি। হৃদয়ের স্তরে স্তরে এই যে ঘনকম্পিত অস্থিরতা—আজন্ম অর্জিত অবরোধ স্খলিত হতে চাইছে অসার নির্মোকের মত—এ শুধুই উন্মাদনা? অথবা—

প্রাচীর-লম্বিত দর্পণে দৃষ্টিপাত করলেন তিনি। অন্ধকার। কোনও প্রতিবিম্ব নেই সেখানে। কিন্তু নূতন করে কি দেখবেন তিনি? নগর ভ্রমণে ক্লান্ত, অবিরাম অশ্বচালনায় পরিশ্রান্ত, স্বেদসিক্ত, ধূলিলিপ্ত কেশপাশ—নিজের সেই হতশ্রী মূর্ত্তিখানি দর্পণে বহুবারই তো দেখেছেন তিনি। সেই মুখে—সেই মূর্ত্তিতে কোনও পুরুষ হৃদয়ে মোহ সঞ্চার করবার মত কিছু ছিল কি?

মণিমান!—আর্ত্ত এক আবেগ দীর্ঘশ্বাসের মত আলোড়িত করল তাঁকে। সময় কখনও ক্ষমা করে না কাউকে। জীবনের প্রতি পদে পদে সন্ধানী ব্যাধের মত অশ্রান্ত তার অনুসরণ। সে শুধু অবসর খোঁজে, অবকাশ প্রাপ্তিমাত্রে নির্ঘাত হয় তার নিষ্ঠুর শরক্ষেপ।

বিদ্ধ, ব্যথিত, যন্ত্রণাহত এক অস্তিত্বের নিদারুণ নিঃসঙ্গতা অনুভব করলেন তিনি। সর্ব শরীরে পরিব্যাপ্ত হল এক তীব্র চঞ্চলতা। বাইরের নিঃসীম অন্ধকারে দৃষ্টি রেখে ভাবলেন—কি যায় আসে! মণিমান সুখী হোক। গন্ধর্বের কল্যাণ হোক। মণিপুরের পথে পথে যদি লুণ্ঠিত হয় কোনও দুরাশাদীর্ণ হৃদয়—এই পৃথিবীর কোথায়—কার কতটুকু ক্ষতি হয় তাতে!

উন্মুক্ত বাতায়ন পথে অবারণ নিশীথ বায়ু নীরবে বয়ে গেল। আন্দোলিত হল অলকগুচ্ছ। কার শীতল করাঙ্গুলির মত শান্ত স্পর্শ সঞ্চারিত হল তাঁর অধরে, কপোলে, স্বেদসিক্ত উত্তপ্ত ললাটে।

রাত্রির প্রথম যাম। অন্ধকার গাঢ়তর এখন। অনেক ঊর্দ্ধে কৃষ্ণকান্ত আকাশের প্রান্তে প্রান্তে অসংখ্য নক্ষত্র—নিশীথিনীর নিবিড় কেশপাশে অগণিত স্বর্ণ বিন্দুর মত নীরবে আলোক বিকীরণ করে চলেছে তারা।

'কোন অন্ধকার অন্তহীন নয়। সব ক্ষত নিরাময় হয়, সব যন্ত্রণার শুশ্রূষা সঞ্চিত আছে সময়েরই হাতে।

মণিমান—বন্ধু—হায় নির্বোধ গন্ধর্ব! যে চক্ষু ছিল চির নিমীলিত তুমি উন্মীলন করলে তাকে। চির অচেতন এক স্বত্তার গভীরে তুমিই পাঠালে জাগৃতির আহ্বান। তুমিই জানালে—সুদূর শক্তিমান এক জাতির সঙ্গে শুধু মিত্রতাই নয়—আত্মিক বন্ধন স্থাপনের সুযোগও রয়েছে আয়ত্ত সীমানায়।

কিছুই অস্পষ্ট ছিল না আর। ভবিষ্যৎ ভাবীকাল—সহস্র-বন্ধন বিজড়িত একক পথযাত্রার করুণ পরিণাম সুস্পষ্ট ভবিতব্য লিপির মতই চিত্রিত হল তাঁর চক্ষের সম্মুখে।

পরিমাণহীন এই প্রমাদের দায় বহন করতে হবে বৈকি। তবে একা তোমাকেই নয় মণিমান।

॥ ৭ ॥

অবশেষে মনস্থির করলেন অর্জুন।

না করে আর উপায়ও নেই কিছু তাঁর।

নিরবচ্ছিন্ন এই হৃদয-সংগ্রামে তিনি ক্লান্ত। ধৈর্য্যসীমা অতিক্রান্ত হয়েছে বহুদিন। নিতান্ত নির্লজ্জের মতই পড়ে আছেন মণিপুরে। একস্থানে এত দীর্ঘকাল বাস পর্যটকের পক্ষে অশোভন—তথাপি আছেন, প্রস্থান করতে পারেন নি।

পারেন নি—কারণ প্রস্থানের চিন্তামাত্রেই হৃদয়ের তন্ত্রীতে পড়েছে টান—অচ্ছেদ্য সেই আকর্ষণ উপেক্ষা করা অসাধ্য ছিল তাঁর।

পার্ষদরা পরিত্যাগ করেছে তাঁকে। তাদের অপরাধ নেই। তাঁর সদা-সন্তপ্ত চিত্ত তাদের রঙ্গালাপে অংশ নিতে পারে না। দীর্ঘকাল তিনি সঙ্গ দেন নি তাদের মৃগয়া কিংবা দ্যূতক্রীড়ায়। তাঁর দিবাভাগ ব্যতীত হয় মণিপুরের পথ পরিক্রমায়, আর দিবাবসানে তারা সকলে একত্রিত হয়ে মাধ্বী কিংবা তাম্ভি পাত্র যখন উন্মোচন করে—সে প্রমোদ বাসরে উপস্থিত হতেও তাঁর বিতৃষ্ণা বোধ হয়—যোগদান তো পরের কথা।

তিনি জানেন অন্তরালে তারা তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করে। সুখ-শ্রাব্য নয় সে আলোচনা। কৌতুক এমন কি শ্লেষেরও পাত্র হয় তো তিনি হয়ে উঠেছেন তাদের চক্ষে। নারী উপলক্ষ্য করে কোনও পুরুষের এমন মনোবিকারের কোনও সদর্থ নেই তাদের কাছে। ইচ্ছা যদি হয় —বাসনা যদি জাগ্রত হয়ে থাকে—সে বাসনাপূরণই সর্বাপেক্ষা সহজ উপায়। সে জন্য এমন উদাস—উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে দিনক্ষেপ করবার প্রয়োজন কি? স্বর্ণ, রত্ন, গোধনের মত রমণীও ভোগ্যবস্তু। সহজে প্রাপ্ত না হলে সবলে অধিকার করতে হবে। বাহুতে যখন বল আছে,

হাতে শরাসন এবং শরাশ্রয়ে শর—তখন এত দূর চিন্তার প্রয়োজন কি! উত্তমা নারী লুণ্ঠিতই হয়ে থাকে চিরকাল।

তাদের সকল যুক্তি এবং তর্ক যখন ব্যর্থ হয়েছে, তখন তাঁর সম্বন্ধে আর অধিক চিন্তা অনাবশ্যক বোধে তাঁর সঙ্গই পরিত্যাগ করেছে তারা। বৈচিত্র্যহীন দীর্ঘ একারণ্য বাসে তারা ক্লান্ত। ক্লান্তি অপনোদনে সর্বদা মৃগয়া-ব্যস্ত থাকে। নূতন দেশ সম্বন্ধে কৌতূহল সমাপ্ত হয়েছে, দর্শন-যোগ্য আর কোথাও কিছু নেই। অতঃ দিবারাত্র মৃগ পশুদের তাড়না ভিন্ন আর কোন কর্মে সময় ব্যতীত করতে পারে তারা?

পুরুধান বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ করেছেন। তাঁর মুখ গম্ভীর, রেখাঙ্কিত ললাটে সুস্পষ্ট অসন্তোষ। অপ্রসন্ন মুখেই একদিন স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন—বসন্ত ঋতু বিগতপ্রায়, বনভূমি তৃণশূন্য হয়েছে। বাহনদের জন্য প্রয়োজনীয় শষ্প-সামগ্রীর অভাব দেখা দেবে অচিরে। অশ্ব এবং অশ্বতররা সর্বদা ক্ষুধার্ত থাকে এখনই।

পানযোগ্য নির্মল জলেরও অভাব দেখা দিয়েছে অরণ্যে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝর ধারাগুলি এখন শুষ্ক ও পঙ্কিল। গ্রীষ্মাগমে এই বন সুখকর হবে না। অতএব সত্বর এ স্থান ত্যাগ করা কর্তব্য।

—কর্তব্য অবশ্যই—এবং অনতিবিলম্বে।

কারণ শুধু যে সঙ্গীরা বিরক্ত হয়ে উঠেছে এবং অরণ্য-বসবাসের অযোগ্য তাই নয়, সম্প্রতি মণিপুর রাজের এক দূত এসেও স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেছে সে কথা। না—শালীনতার সীমা অতিক্রম করেনি সে, সৌজন্যে কোন ত্রুটি ছিল না। অত্যন্ত বিনীত কিন্তু দৃঢ়স্বরে পুরুধানের কথারই পুনরাবৃত্তি করে গেছে সে—মণিপুর মহারাজের বিবেচনায় পাণ্ডুপুত্র অনেকদিন একই অরণ্যে বাস করছেন। একারণ্যে বহুদিন বাস কিংবা মৃগয়া ক্ষত্রিয় জাতির নীতি বহির্ভূত। এই অরণ্যের ভোগ যোগ্য ফল কন্দ শেষ হয়েছে। ক্রমাগত মৃগয়ায় পশুরা ভয়ত্রস্ত। আর অধিক বধ করলে একেবারে বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে। পাণ্ডব বুদ্ধিমান, বিবেচকও বটে। এখন স্থান পরিবর্তন করা আবশ্যক তাঁর।

চিরহরিৎ বৃক্ষরাজি শোভিত আরও অরণ্য মণিপুরে আছে, ইচ্ছা করলে সে সব স্থানে যেতে পারেন তিনি। অথবা অন্য কোথাও—পর্যটকের পক্ষে সব দেশই সমান। সর্বদা ভ্রমণই বিধেয় তাঁদের।

অত্যন্ত অবমানিত হয়েছিলেন অর্জুন। মণিপুররাজ তাঁকে আবাহন করেন নি, আমন্ত্রণের কোনও আভাস নেই তাঁর বার্তায়। বরং ইঙ্গিত সুস্পষ্ট—অর্জুন মণিপুর ত্যাগ করলেই তিনি সুখী হন।

তিক্তস্বরে পুরুধান বলেছিলেন, ভরতবংশের গৌরব বর্দ্ধিত হল বটে! বর্বর এক পার্বত্য গোষ্ঠীপতি ক্ষত্র-কুলোত্তম পাণ্ডুর পুত্রকে নীতিশিক্ষা দিয়েছেন। যাঁকে আতিথ্য দান করতে পারলে ভারতের যে কোনও চক্রবর্তী মহারাজ কৃতার্থ হন, এই রাজা তাঁকে—এর পরেও কি আপনি এখানেই বাস করতে চান কুমার?

নতশির অর্জুন নিরুত্তরে সহ্য করছেন সে তিরস্কার।

কি বলবেন তিনি। দেবার মত প্রত্যুত্তর কি তাঁর আছে! তিনি নিজেও তো জানেন অনুচিত হয়ে উঠেছে তাঁর আচরণ। ভিন্নদেশী ভ্রাম্যমান এক আগন্তুক—নিজেকে তীর্থ পর্যটক বলে পরিচিত করেছেন যিনি—পররাজ্য সীমানার মধ্যে এত দীর্ঘকাল বাস করলে সব নরপতিই ব্যস্ত হয়ে উঠবেন। মণিপুর নরেশের আচরণে অসৌজন্য যদি কিছু প্রকাশ পেয়ে থাকে তার জন্য অর্জুন নিজেই তো দায়ী।

পুরুধান বলেছিলেন নারীর জন্য উন্মত্ততা আপনাদের রক্তধারায় বর্তমান। রাজা বিচিত্রবীর্য্যের উন্মত্ত নারী সম্ভোগের দুঃখকর পরিণাম সকলেই জানে। আপনার প্রপিতামহ শান্তনু বৃদ্ধ বয়সে এক ধীবর রমণীর প্রণয়ে নিমজ্জিত হয়ে কুলতিলক পুত্রকে চির বঞ্চনায় নিক্ষেপ করেছেন। সূর্য্যকন্যা তপতীর জন্য প্রায় আত্মহননোদ্যত সংবরণের কথাও আপনার অজানা নয়। কিন্তু পার্থক্য এই যে সেই পুরুষদের আকাঙ্খিতা নারীরাও ছিলেন তাঁদের প্রতি অনুরক্তা। কিন্তু আপনি কৃচ্ছ্রসাধন করছেন কার জন্য? চিত্রাঙ্গদা আপনাতে অনুরক্তা নন, অনুমাত্র আকর্ষণ কখনও প্রকাশ করেন নি আপনার প্রতি। অথচ

আপনি কদন্ন—কটু কষায় বনফল আহার ও মলিন পল্বল জল পান করে দীর্ঘ দুঃখবরণ করছেন সেই এক অনার্য্যা নারীর জন্য। ধিক্ পাণ্ডব, ইন্দ্রিয়পরবশ হয়ে কুলমর্য্যাদা তো বটেই স্বকীয় মূল্যও বিস্মৃত হয়েছেন আপনি।

নির্বাক আরক্ত মুখ অর্জুনকে বিদ্ধ করে আরও বলেছিলেন তিনি—ভাল। এখন ইন্দ্রপ্রস্থে সংবাদ প্রেরণ করা ভিন্ন আমার আর কোন কর্ত্তব্যই অবশিষ্ট নেই। যুধিষ্ঠির আপনার হিত চিন্তা করুন, মাতা কুন্তী বিবেচনা করুন কেমন করে গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন তাঁর মতিভ্রষ্ট পুত্রকে, আর বিবাহের অব্যবহিত পরেই লোকললামা যে ধর্মপত্নীকে আপনি পরিত্যাগ করে এসেছেন—এত শীঘ্র তাঁকে বিস্মৃত হয়ে এক অরণ্য-চারিণীর চিন্তায় নিজেকে ক্ষয় করছেন—এ সংবাদ জেনে পাঞ্চাল রাজকুমারীও আশাকরি আহ্লাদিতাই হবেন।

অতি দুঃখেও ঈষৎ কৌতুকবোধ করেছিলেন অর্জুন। পুরুধান ভয় দেখাতে চাইছেন তাঁকে। ইন্দ্রপ্রস্থ বহুদূর। ইচ্ছা করলেই সংবাদ প্রেরণ করা সম্ভব নয় সেখানে।

অথবা—সম্ভব হলেই বা কি আসে যায়। মাতার জন্য চিন্তা নেই তাঁর। ভ্রাতৃগণ তাঁকে জানেন। মধ্যমাগ্রজ ভীমের ক্রোধ কিছু প্রবল। তাঁর তিরস্কারগুলিও কঠিন তথা উচ্চ হয়ে থাকে প্রায়শঃই। কিন্তু তাঁকে শান্ত করতে পারবেন অর্জুন। বিশেষতঃ তিনি নিজেও তো এক অনার্য্যা নারী গ্রহণ করেছেন। পাণ্ডবের কুলমর্য্যাদা কিছু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়নি তাতে। বরং লাভবানই হয়েছেন তাঁরা। ভাগিরথীর পরপার এবং মধ্যাঞ্চলের অরণ্যভূমিতে তাঁদের আধিপত্য নিষ্কণ্টক হয়েছে।

অভিজ্ঞতা এবং সন্নিকট-দর্শন থেকে অর্জুন জানেন অরণ্য পর্বত তথা অন্ত্যেবাসী এই অনার্য্যরা নিতান্ত উপেক্ষার নয়। শক্তিমান, শ্রমপরায়ণ, বিশ্বস্ত তেমন কোনও জাতির সঙ্গে সখ্যতা অথবা আত্মীয়তা স্থাপিত হলে পরিণামে উপকৃত হবেন তাঁরা।

আর দ্রৌপদী। অতি ক্ষীণ—কিন্তু বক্র এক হাস্যরেখা প্রস্ফুটিত হল তাঁর অধরে। পঞ্চস্বামীর বণিতা তিনি। একা অর্জুনের জন্য শিরঃপীড়া ঘটাবার মত অবকাশ তাঁর নেই। আর্য্যনারীরা তো চিরকালই সপত্নী সহ সংসার যাপনে অভ্যস্ত। অর্জুন যদি একাধিক নারী গ্রহণ করেন পাঞ্চালীর অসুখী হবার কারণ নেই।

অতএব—কিছু করতে হবে তাঁকে এবং তা অনতিবিলম্বে। পুরুধান ক্রুদ্ধ, সহচররা বীতশ্রদ্ধ, মণিপুর নরেশ আজ ইঙ্গিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন, কাল সে ইঙ্গিত আদেশে পরিণত হতে পারে।

কিন্তু যে আশায় দীর্ঘকাল অবিরাম এই মণিপুর প্রদক্ষিণ করছেন সে আশা কি এখন ত্যাগ করবেন? ফিরে যাবেন ব্যর্থ—অসফল হয়ে! অসম্ভব। সে চিন্তাও অসহ্য তাঁর। বলপ্রয়োগে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার নয়। বাহুবলে বিজিত, হৃদয়সম্পর্কহীন এক নারী শরীর মাত্র তিনি কামনা করেন না। অসাধারণ ব্যক্তিত্বশালিনী সেই নারী বাহুবলের সমক্ষে আত্মসমর্পণ করবেন না। প্রপিতামহ শান্তনুর সমস্যা সহজ ছিল, রাজা সংবরণও ভাগ্যবান, তপতী অনুরক্তা ছিলেন তাঁতে। অর্জুন দুর্ভাগ্য। চেষ্টা করেও ঈপ্সিতার কৃপালাভে সমর্থ হন নি। যে কমল-পত্র-নেত্রের একটিমাত্র কৃপা-কটাক্ষপাতে কৃতার্থ হতে পারতেন, দীপ্তোজ্জ্বল সে চক্ষু সর্বদাই থেকেছে তাঁর প্রতি উদাসীন।

কিছুই তো গোপন নেই আর। সম্ভবতঃ অর্দ্ধেক মণিপুরবাসী আজ জানে তাঁর ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য। কিন্তু যিনি জানলে ধন্য হতে পারতেন সেই প্রস্তর প্রতিমার ভাবলেশহীন মুখে একটি রেখাও কোনও দিন উদ্রিক্ত হয়নি। ক্রমাগত উপেক্ষিত হয়েছেন আর যত উপেক্ষিত হয়েছেন প্রত্যাখ্যাত পৌরুষের প্রতিজ্ঞা হয়েছে ততই কঠোর। অহঙ্কৃতা এই নারীকে করায়ত্ত না করে মণিপুর ত্যাগ আজ তাঁর পক্ষে আত্ম-অবমাননারই নামান্তর।

বৃদ্ধ পুরুধান। বৃদ্ধরা কি বোঝে যৌবনের ভাষা! তরুণ হৃদয়ের তরঙ্গিত আশা আকাঙ্ক্ষা বার্দ্ধক্যের তটপ্রান্তে কোনও আলোড়নই

সৃষ্টি করতে পারে না। যৌবন যাঁদের অস্তমিত যুবজনের প্রণয়োন্মাদনাকে তাঁরা মনে করেন আধিক্য কিংবা হঠকারিতা। কিন্তু অর্জুন উপলব্ধি করছেন—বাসনা এবং বাসনা-পূরণের মধ্যে এই যে বাধা—এ তাঁকে অতিক্রম করতেই হবে। অবিরাম দুশ্চিন্তাপীড়নে তিনি ক্লান্ত, আহারবিশ্রাম-বর্জিত উদ্দেশ্যহীন অবিরাম ভ্রমণে শক্তিক্ষয় হচ্ছে তাঁর। দিব্যোজ্জ্বল শ্যামকান্তি মসীময় হয়েছে। যে মহাভার গাণ্ডীব তিনি স্বচ্ছন্দে বহন করেন আজ সেই শরাসনে গুণ সংযোগ করতে বোধ করেন অবসন্নতা।

চিন্তা—শুধু পুরুধানের নয়, তিনি নিজেও নিজের জন্য চিন্তিত এখন।

সুতরাং সমাধান চাই—এবং একটিই মাত্র সমাধান সম্ভব এখন—প্রার্থনাই করবেন তিনি।

প্রার্থনা…! শরীর মন সঙ্কুচিত হল। প্রার্থনা করেন নি কখনও। ভরতবংশের উত্তরাধিকারী, মহাবল ভীষ্মের পৌত্র। অপ্রাপ্যে যেমন আকাঙ্খা স্থাপন করেন নি, তেমনই প্রাপ্য বলে যা বোধ করেছেন বীর্য্য শুল্কেই আহরণ করেছেন তা। প্রার্থনায় অনভ্যস্ত তিনি।

সুদীর্ঘ এক তপ্তশ্বাসে অন্তর প্রমথিত হল। উপায় নেই, উপায় নেই। তাঁর উদ্যম পরাভূত, চেষ্টা নিষ্ফল। অচিন্ত্যপূর্ব এক জড়ত্বে উত্তরোত্তর আক্রান্ত তিনি। হৃদয়বন্ধনে তিনি একাই আবদ্ধ, চিত্রাঙ্গদার তো কোনও দায় নেই।

কিন্তু…চকিত বিদ্যুৎ স্পর্শের মত এক চিন্তা স্পৃষ্ট করে গেল তাঁকে। তিনি যদি অন্যানুরক্তা হন? চিন্তামাত্রে মৃত্যুর মত এক হিমশৈত্য-শিহরণ অনুভব করলেন সর্বাঙ্গে। হে ঈশ্বর!…

শঙ্কা-কণ্টকিত দেহ, ব্যাকুল-বিহ্বল দৃষ্টি প্রসারিত করলেন দূর দিগন্তে।

নিষ্করুণ চৈত্রাবসান। আকাশে প্রদীপ্ত সূর্য্য। নির্দয় অগ্নিবর্ষণে পীড়িত পৃথিবী। নিষ্পত্র তরুশ্রেণী নগ্ন শাখা শূন্যে প্রসারিত করে

আদিম বৃক্ষ কঙ্কালের মত স্থির। উচ্ছৃঙ্খল গ্রীষ্ম বাতাসের তাড়নায় তাড়িত শুষ্ক পত্ররাশি, ঘূর্ণচ্ছন্দে আবর্তিত হচ্ছে অরণ্যের ধূলি জঞ্জাল। এই সে দিনের শতশ্রী মণ্ডিত সুন্দরী অরণ্যভূমির কি রিক্ত রূক্ষরূপ!

অর্জুনের মনে হল শুধু বাহিরে নয়, এই তাপ, এই দাহ, ছায়া-দাক্ষিণ্যবর্জিত এই বহ্নিস্রোত তাঁর অন্তরেও সমভাবে বহমান। সেখানেও এমনি অসংখ্য চিন্তার তাড়না, অশান্ত চিত্তের উচ্ছৃঙ্খল বাসনা বিকার।

কি করবেন!

মাতার অঞ্চল ছায়াচ্যুত, ভ্রাতৃগণের স্নেহ সান্নিধ্য থেকে বহুদূরে, প্রবাসে, বিদেশে আপন অস্তিত্বের নিদারুণ সঙ্কট যেন প্রত্যক্ষ করলেন তিনি।

হায়! তন্তু কীটের মত নিজেরই রচিত মৃত্যুব্যূহে তিলে তিলে আবদ্ধ করেছেন নিজেকে। কেমন করে উদ্ধার হবেন—কে রক্ষা করবে তাঁকে!

॥ ৮ ॥

বিচিত্রবাহন জানতেন তিনি আসবেন। তাঁর এই পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতা বহু পূর্বেই সচেতন করেছে তাঁকে সে আশঙ্কা সম্বন্ধে।

—হাঁ আশঙ্কাই।

আশঙ্কা বোধ করেছিলেন বলেই অর্জুনের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন তিনি। রাজকার্য ত্যাগ করলেও কয়েকজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিগত গূঢ়পুরুষ তিনি আজও পোষণ করেন। তারাই এনে দিয়েছে সংবাদ। অর্জুনের আচরণ, তাঁর ইচ্ছা, আশা, অভীপ্সা সম্বন্ধে।

অন্তরে অন্তরে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। বার্দ্ধক্যের আক্রমণে জীর্ণ দেহ মনোবৃত্তিকেও বোধ হয় দুর্বল করে দেয়। অন্যথায় আপাতঃ দৃষ্টে শঙ্কার কারণ কিছু না থাকলেও অস্পষ্ট, অনির্দেশ্য দূরাগত এক বিপর্যয়ের আভাস যেন অনুভব করছিলেন। ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের ইঙ্গিত? জানেন না। কিন্তু সতর্ক হয়েছিলেন এবং একসময় মনে হয়েছিল ঘটনা আর অধিক বিলম্বিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

অবস্থার গুরুত্ব অনুমান করে প্রতিবিধানের একটা ক্ষীণ চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। কন্যার অজ্ঞাতসারে, মন্ত্রী ভানুমানকে পর্য্যন্ত না জানিয়ে গোপনে দূত প্রেরণ করেছিলেন অর্জুন সকাশে। ইঙ্গিতে আভাস দিয়েছিলেন—তিনি মণিপুর ত্যাগ করলেই এখন মঙ্গল হয়।

ফল কিছু হয় নি।

হয় নি যে—আজ সপার্ষদ পাণ্ডবের প্রাসাদ অভিযানেই তার প্রমাণ।

কিন্তু তিনি এখন কি করবেন? পাণ্ডুপুত্রের উদ্দেশ্য তিনি অনুমান করতে পারেন। কি উত্তর দেবেন?

প্রার্থনা পূর্ণ করবেন তাঁর?

এক পলকের জন্য আদরিণী কন্যার নয়নানন্দ মূর্ত্তিখানি আভাসিত হল চক্ষের সম্মুখে।

চিত্রাঙ্গদা তো শ্বশুরালয়ে যাবেন না। তাঁর বিবাহের প্রথম শর্তই তো এই। পার্থ যদি সম্মতও হন—কি পরিণাম হবে এই বিবাহের?

রাজ্য, রাজপদবী, মাতা ও ভ্রাতৃগণকে ত্যাগ করে অর্জুন নিশ্চয় বাস করবেন না মণিপুরে বিবাহের তাহলে অর্থ কি? চিত্রাঙ্গদারই বা ভবিষ্যৎ কি?

চিরকাল স্বামীসঙ্গ বঞ্চিতা একাকিনী বাস করতে হবে তাকে।

কি দিয়ে যাচ্ছেন তিনি কন্যাকে?

এই রাজ্য? দুর্বহ কর্তব্যভার এবং চির নিঃসঙ্গতা?

সহস্র কর্ম আর কর্ত্তব্যের পাকে পাকে গ্রন্থিত, চির-অচঞ্চল দায়িত্বভার আর সেই ভাবে নুব্জপৃষ্ঠ একাকিনী এক নারীত্বের তিল তিল নির্বাপণ যেন প্রত্যক্ষ করলেন তিনি।

নিরুপায় পিতৃহৃদয় হাহাকার করে উঠলো। ব্যাকুল চক্ষে অদূরে উপবিষ্ট ভানুমানের পানে চাইলেন।

ভানুমান বললেন, প্রত্যাখ্যান বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে মহারাজ।

জলমগ্ন ব্যক্তির তৃণ অবলম্বনের মতই অন্তিম যুক্তি আহরণ করলেন তিনি, কিন্তু গন্ধর্বেরা তো গোষ্ঠীভঙ্গ সমর্থন করে না।

—সে চিন্তা গন্ধর্বের, অর্জুনের নয়। গোষ্ঠীর সংকট উপস্থিত হয়েছে, এখন অপ্রিয় হলেও অনিযম সমর্থন করতে হবে। বৃহত্তর কল্যাণের জন্যই তা প্রয়োজন।

—কিন্তু মণিমান—তার কথা—আপনি কি জানেন—

জানি, বাধা দিলেন ভানুমান। কি আসে যায়! মণিমান তাঁর পুত্র। সুযোগ্য, সমর্থ, যশোবর্দ্ধন পুত্র। কিন্তু কি আসে যায় তাতে? এই মুহূর্তে কোনও ব্যক্তির—বিশেষের ইচ্ছা, আশা কিংবা মনোভাবের কথা জানতে বুঝতে চিন্তা করতে চান না তিনি।

সেই কবে—কোন অতীতে মণিপুর নামক এই ক্ষুদ্র জনপদের শুভাশুভ, কল্যাণ অকল্যাণের দায়ভার স্কন্ধে ধারণ করেছিলেন। তারপর আর কোনও কথাই কি তিনি চিন্তা করেছেন?

বিগত হয়েছে কত কাল। যৌবনের দীপ্ত দ্বিপ্রহর কখন অতীত হয়ে গেছে তাঁর অজ্ঞাতসারেই। পুত্র, কন্যা প্রিয় পরিজনের চিন্তা হৃদয়ে স্থান দেবার অবকাশ মাত্র পান নি। তারা আছে—শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্তের যে আদিম নিয়মে আবর্ত্তিত হয় এই পুরাতনী পৃথিবী, সেই একই নিয়ম মত তারাও বর্দ্ধিত হয়েছে, প্রবাহিত হয়েছে তাদেরও জীবনধারা।

এর অধিক কিছু জানেন নি, জানবার সময় বা সুযোগই কি পেয়েছেন কোনও দিন?

তাহলে আজ—এত কাল পরে—জীবনের এই সান্ধ্য প্রহরে পদার্পন করে কেন তাদেব কথা চিন্তা করবেন?

সমষ্টির যখন সঙ্কট কাল—তখন আপন আত্মজের বিষণ্ণ মুখচ্ছবি স্মরণ করে কেন ঘটাবেন কর্ত্তব্যে প্রত্যব্যয়!

বারেকের জন্য বৃদ্ধ রাজার মুখপানে চাইলেন তিনি। অনেক কালের সঙ্গী তাঁরা। সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনার অনেক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছেন একসঙ্গে। গভীর শ্রদ্ধা ও মমত্ব বোধে নম্র হল হৃদয়। শূন্য কক্ষে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করলেন দুই বৃদ্ধ। তারপর মুখ ফেরালেন ভানুমান—শান্ত স্বরেই বলতে পারলেন,—পার্থকে উপস্থিত হতে আদেশ দিন মহারাজ। অধিক বিলম্ব অসৌজন্যের পরিচায়ক হতে পারে।

কিন্তু···

রাজা প্রজার প্রভু নন, প্রজাস্বার্থের প্রহরী মাত্র বলা যায় তাঁকে। মহত্তর অকল্যাণ আপনার দ্বারে উপস্থিত, মহত্তম আত্মত্যাগই পারে তাকে কল্যাণে পরিবর্ত্তিত করতে।

অনেকক্ষণ—অনেক অধিক সময়ের প্রয়োজন হল বিচিত্রবাহনের। তিলে তিলে হৃদয় দৃঢ় করলেন তিনি। 'তিলে তিলে আত্মস্থ করলেন আপনাকে। না কেউ নয়—কিছু নয়। পৃথিবীতে সব সাফল্যই সার্থকতা বহন করে আনে না। কোনও কোনও ব্যর্থতাও অর্থবান হয়ে ওঠে বৃহত্তর সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে।

মমতা নয়, জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাত কোনও আশঙ্কাকেও স্থান দেবেন না তিনি হৃদয়ে—

'রাজা প্রজা কল্যাণের প্রহরী মাত্র'—

তাই হোক। ভগবান ভবানীপতির নামে ধর্মরক্ষা করবেন তিনি। সবার উপরে তাঁর সেই রাজধর্মই জয়যুক্ত হোক।

নমস্কার-অভিনন্দনে তাঁকে যথোচিত সম্বর্দ্ধিত করলেন অর্জুন। পাদ্য অর্ঘ্য, আসনাদির প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্রও না করে বললেন, রাজন, এইসব সাধারণ উপচারে আমার কোনও আকর্ষণ নেই। এক অসাধারণ অভীষ্ট লাভে যাচকরূপে আপনার দ্বারে উপস্থিত হয়েছি। যদি ইচ্ছা হয় আমার সে প্রার্থনা পূর্ণ করুন। অগ্রিম আশ্বাস পেলে তবেই নিবেদন করতে পারি তা।

নিষ্পলক দৃষ্টিপাতে তাঁর পদনখ থেকে কেশাগ্র পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করলেন বিচিত্রবাহন। কঠিন মুখভাব কোমল হয়ে এল ক্রমে। জনপ্রবাদ মিথ্যা নয়। কন্দর্প-বিনিন্দিত কান্তিই বটে। সরল মর্যাদা দীপ্ত মুখশ্রী, অভিজাত ব্যক্তিত্বপূর্ণ আচরণ।

বহুদূর থেকে ভাট এবং সূতমুখে কুরুকুলের এই কুমারটির যশোগাথা যত শুনেছেন তার অনেকটাই সম্ভবতঃ সত্য।

শান্তস্বরে বললেন, প্রার্থনা প্রকাশ করুন পাণ্ডব। নিতান্ত অসাধ্য না হলে অবশ্যই পূর্ণ হবে। আমার ধর্ম এবং প্রজাকল্যাণ ব্যতিরেকে আর সবই পাবেন আপনি।

একমুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করলেন অর্জুন। চক্ষু নত হল। চকিত দৃষ্টিপাতে অনুমান করতে চাইলেন বিচিত্রবাহনের মনোভাব। তারপর বললেন, আপনার কন্যা বরবর্ণিনী চিত্রাঙ্গদাই আমার অভীষ্ট। আমাকে কৃতার্থ করুন রাজন্।

কয়েকটি মুহূর্ত্ত।

সংশয় এবং শঙ্কার এক পরিমণ্ডল ঘনিয়ে এল কক্ষের বাতাসে।

ক্ষণিকের জন্য বৃদ্ধ রাজার ললাটে ঘনালো ভ্রুকুটি। অস্বস্তিতে কিঞ্চিত অস্থির হলেন ভানুমান। তাঁর পানে চেয়ে নিজেকে স্থিতধী করলেন বিচিত্রবাহন। দৃঢ়স্বরে বললেন, এই কন্যা আমার পুত্রিকারূপে প্রতিপালিতা। অপুত্রক আমি তাঁকে পুত্রজ্ঞান করে থাকি। আমার অবর্ত্তমানে ইনিই হবেন মণিপুর-ঈশ্বরী। তিনি আপনার গৃহে যাবেন না, আপনার বশ্যা হবেন না কখনও। তাঁর সন্তান-সন্ততির মধ্য দিয়েই প্রবাহিত থাকবে মণিপুর রাজবংশের ধারা। অতএব সন্তানের উপরেও আপনার থাকবে না কোনও অধিকার। পিতৃ-পদবী নয়—বস্তুতঃ মাতার পরিচয়েই পরিচিত হবে তারা। বলুন কৌন্তেয়, এই শর্তাধীন বিবাহে আপনি সম্মত?

পত্নী হবেন না বশ্যা—অপত্যেও থাকবে না অধিকার!—এক মুহূর্তের জন্য চিত্ত বিদ্রোহী হয়ে উঠল অর্জুনের ভরত বংশের মর্য্যাদার আর কি অবশিষ্ট রইল তাহলে!

স্থৈর্য্য অন্তর্হিত হল। প্রশস্ত ললাটে দেখা দিল কঠিন ভ্রুকুটি। চঞ্চল করাঙ্গুলি বজ্রমুষ্টি রচনা করতে চাইল গাণ্ডীবের মেরুদণ্ডে।

স্পর্দ্ধিত এই শর্ত নিক্ষেপের দণ্ড কি এখনই দেবেন এই বৃদ্ধকে? রাজ্য এবং রাজকীয় অহঙ্কার একই সঙ্গে ভস্মসাৎ করে প্রতিষ্ঠিত করবেন আপন সত্য পরিচয়!

পরমুহূর্তেই আত্মসম্বরণ করলেন তিনি। উপায় নেই, স্বীকার করতেই হবে। যত অবমাননাকরই হোক এই শর্ত অস্বীকার করবার সাধ্য তাঁর নেই। অনেক যন্ত্রণা-দহনের মধ্য দিয়ে এই প্রথম উপলব্ধি করেছেন তিনি—শক্তিই সিদ্ধির শেষ সাধন নয়। যাঁকে লাভ করতে না পারলে জীবনধারণই অর্থহীন—তাঁকে প্রাপ্ত হবার জন্য এমন কোন শর্ত আছে—যা স্বীকার করতে পারেন না তিনি।

বাহুবল নিরর্থক, বীর্য নয়—শর্তহীন এই সমর্পণই শুল্ক হোক সেই অলোকলক্ষণার।

নতশির, কৃতাঞ্জলী, পরন্তপ পার্থ বললেন,—আমি প্রস্তুত গন্ধর্ব্বরাজ।

সমাপ্ত